A Book by SCIENCE INDIA

Struggle for Swatantrata through Science

75

THE UNSUNG WARRIORS OF SWATANTRATA

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL BIOLOGY

The Institute was established in 1935 as the Indian Institute of Medical Research and became a unit of CSIR in 1956. It owed its origin to the inspiration of prominent personalities like Gurudev Rabindranath Tagore, Acharya Prafulla Chandra Roy, Pandit Jawaharlal Nehru and many others. Today, by its mandate CSIR-IICB is engaged in research on diseases and certain biological problems of global interest.

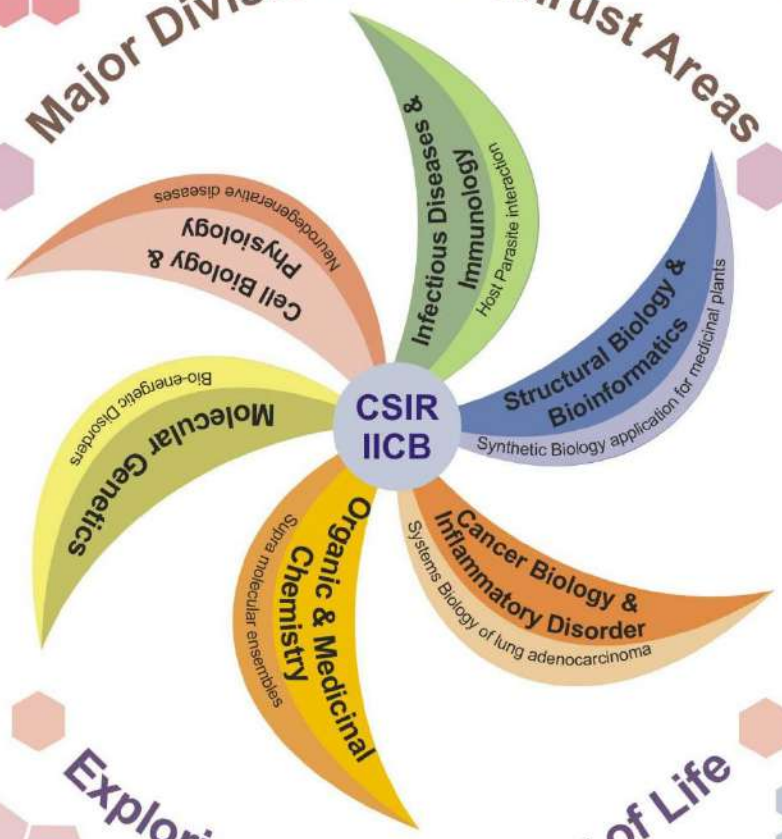

Generating Knowledge Globally
- Publishing Papers/ Year > 185
- Average Impact Factor > 3.3

Transforming Knowledge into Wealth (IP)
- Filing Patents/Year > 8
- Patents Granted/Year > 4

Potential Technologies Developed Recently
- Biomarker for valvular heart disease
- Microbicidal Contraceptive to Prevent HIV
- Gene Therapy for Mitochondrial Diseases
- Visceral Leishmaniasis Detection Kit
- Anti-leishmanial Drug Candidates
- Anti-asthmatic Drug Candidates
- DNA Vaccine against Kala-Azar
- Anti-cancer Drug Candidates
- Anti-ulcer Drug Candidates

A symbiosis between chemistry and biology that translates to a commitment to higher standards of health for all.
Institute-Industry tie up recently rolled out PROSTALYN - a herbal composition for Prostate diseases.
Other products or processes accepted by industries for marketing: a herbal composition against chronic myeloid leukemia (CML), a potent DNA vaccine against Kala-azar, a diagnostic technology to detect a protein associated with pregnancy and embryo, a herbal extract & composition for peptic ulcer diseases.

Building People and Institution
Initiated and nurtures NIPER, Kolkata (National Institute of Pharmaceutical Education and Research); PhD Registration under AcSIR; Three schools adopted & receives laboratory aids.

Infrastructures to be operationalized
Salt Lake Campus; New Laboratory Building, Jadavpur Campus; CSIR Innovation Complex, Baruipur, South 24-Parganas

CSIR-IICB, Salt Lake Campus

Major Facilities Available
- State of the art Instrumental facilities
- Modern Animal House
- Modern Library Computer Division

Contact:
Director, CSIR-IICB
Phone: +91 33 2473 0492; Fax: +91 33 2473 5197, +91 33 2472 3967
E-mail : director@iicb.res.in

4, Raja S.C. Mullick Road, Kolkata-700 032, West Bengal, India
Website: www.iicb.res.in

सीएसआईआर- केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत सीएसआईआर की एक अंगीभूत प्रयोगशाला

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MINING AND FUEL RESEARCH (CIMFR), DHANBAD, a constituent laboratory under the aegis of Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi aims to provide R&D inputs for the entire coal-energy chain encompassing exploration, mining and utilization with the Vision "To be an internationally acclaimed mining and fuel research organisation"

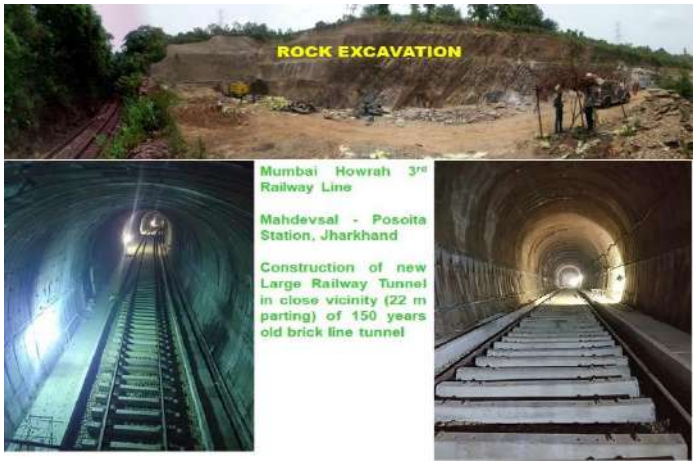

Major Contributions of CSIR-CIMFR are:

- Development of Safe Methods and Assessment of Stability of Mine Workings
- Design of Backfilling Systems for Stabilization of Mine Workings
- Design of Safe Blasting Patterns of Mines
- Assessment of Subsidence and Ground Movement due to Mining
- Design of Environmental Management Plan for Eco-Friendly Mining and Coal Based Industries
- Investigations on Methane Emission due to Mining and GHG Inventories

- Resource Evaluation and Reservoir Modeling of Coal bed Methane
- Evolution of Methods to Control Mine Fire
- Design of Support Systems for Mines
- Design & Development of Equipment, Instruments and Components for Safe Mining
- Coal Quality Assessment
- Basic Studies on Coal Science
- Coal Preparation
- Coal Carbonization
- Coal Liquefaction – Direct and Indirect routes
- Coal Gasification
- Coal Combustion
- Non Fuel Uses of Coal/ Value Added Chemicals
- Fly Ash Utilization

CSIR-CIMFR also extends testing, evaluation, calibration and consultancy services for explosives and accessories, mine ventilation and safety equipment, roof supports, personnel protection equipment, flameproof and intrinsically safe equipment, electrical cables, mining and allied industrial components, wire ropes, cage and suspension gear components, aerial ropeways, etc., for their safe use. All facilities for conventional & instrumental analysis of coal & coke, coal washing pilot plant, pilot coke oven by electrical heating & non-recovery type, XRF, XRD, FTIR, FETR, DTF, TGA, Surface Area Analyser, Porosimeter, coal water emulsion, GTL, PTGA-MS, HPLC, CPT, IPT, etc; EIA & monitoring of air, water, noise & soil pollution, GC, particle size analyzer, washability investigations on coals for cleaning potentialities, various laboratory tests on coal preparation, coal washing pilot plant for coarse and fine coal beneficiation.

For Further Information Please Contact:

Prof. Arvind Kumar Mishra

Director

CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research

Barwa Road, Dhanbad – 826 015 (Jharkhand)

Phone : 91-326-2296023/ 2296006/ 2381111

Fax : 91-326-2296025/2381113

E-mail : director@cimfr.nic.in

Website:- www.cimfr.nic.in

CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur : 713209

Mechanized Drain Cleaning System

- High pressure jetting system with recycled water
- Post cleaning inspection unit

Integrated Solid Waste Disposal System

- Integrated & mechanized segregation system for biodegradable & non biodegradable waste

Mob Control Vehicle (MCV)

- 7.5 ton pay load capacity
- Troop carrying capacity : 8+2
- Indigenous strategic technology

Electric Tractor (E-Tractor)

- Suitable for low & marginal farmer
- 2- 2.5 hrs. continuous field operations.
- Operation Speed : upto 30 kmph

Contact Details :
Email : bdg@cmeri.res.in
Web: www.cmeri.res.in
Ph. : +91-97480 22917,
+91-9434330540

Farm Machinery Training and Testing Center

- Approved Farm Machinery Testing Centre
- Commercial & Confidential tests are available

Metal Additive Manufacturing

- Laser-based Direct Energy Deposition (L-DED)
- Accuracy: 1µm (Min. inc.), X,Y Z Axes: 50 µm/m

Boiler Header Inspection Robot

- Encoded data transmission between the robotic system & control unit
- SMD-based circuitries

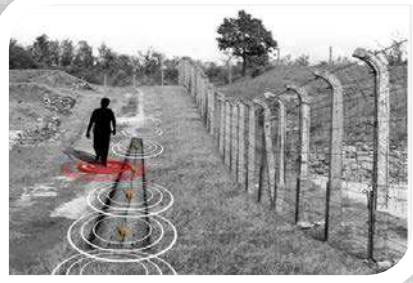

Sensor Suite for Perimeter Surveillance

- Accurate ML based Classification of Intrusion
- Fused Response from Multi-level Intrusion Detection

বিজ্ঞান সাধনার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অকথিত ইতিহাস

Jayant Sahasrabudhe

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভারতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আধুনিক বিজ্ঞানীদের আকস্মিক উত্থান প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ডঃ এস চন্দ্রশেখর বলেছেন, "জাতীয় অভিব্যক্তির স্বার্থে পাশ্চাত্যকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল যে, ভারতীয়রা বিজ্ঞান সহ অন্যান্য সকল দিক থেকে বিশ্বের মানুষের কাছে কোনও অংশে কম নয়"। এই উক্তিটি একদিকে ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্বের বঞ্চনা ও পক্ষপাতমূলক আচরণকে প্রকাশ করে এবং অন্য দিক থেকে এটি সেইসব বিশ্বমানের বিজ্ঞানীদের দেশপ্রেমিক চেতনাকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করে, যারা স্বতন্ত্রতা অর্জনে সফল যোদ্ধা হিসেবে অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শক্তিকে স্পর্ধা দেখিয়েছেন।

এসব সত্ত্বেও আমরা বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করি। ইতিহাসের পাতায় অনেক প্রমাণ আছে যে, কিভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছিল শোষণকারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। সেকালের বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বহু বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল, এরই মাঝে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত পথে বহু প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংঘটিত হয়েছিল। আজ আবার সেইসব অকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে ফিরে দেখার সময় এসেছে, যা জাতীয় ভাবাবেগ গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করবে।

স্বাধীনতা, সেই বহুকাঙ্খিত ভোরকে আমরা পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে ভারতমাতা পরাধীনতার বাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল। শতাব্দী ধরে বয়ে চলা দাসত্বের বন্ধন ঘুছে গিয়ে আনন্দ অহংকারের এক উদ্দীপ্ত মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। এখন ৭৪ বছরের স্বাধীনতা পালনের পর আমরা ৭৫তম স্বতন্ত্রতার অমৃত মহৎসব পালনের শুভক্ষণে দাড়িয়ে আছি, যার উদযাপন শুরু হয় ১৫ই আগস্ট ২০২১।

বহু আকাঙ্খিত স্বতন্ত্রতা, প্রজন্মের পর প্রজন্মের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। এই সংগ্রাম এক দুর্লভ সাহসিকতা ও দুর্দমনীয় আত্মত্যাগের, যার কাছে আমরা চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো। তাই স্বতন্ত্রতা উদযাপন আসলে সেই বীর সেনানীদের স্মরণ, মনন ও যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

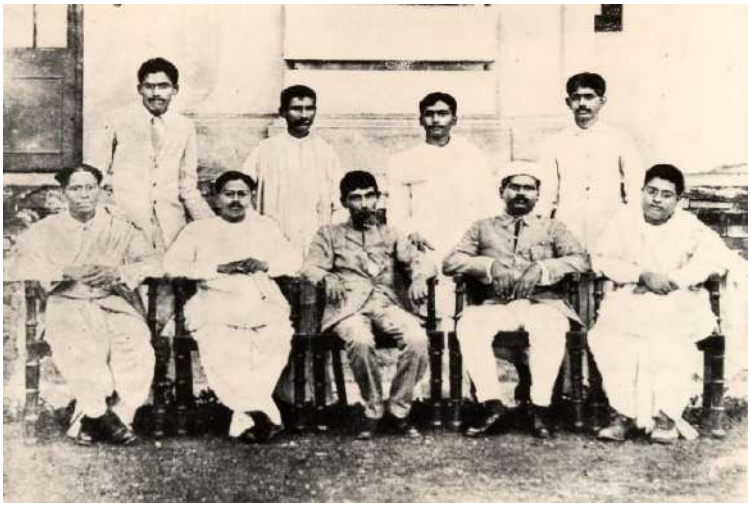

Acharya Prafulla Chandra Ray (sitting, centre) with fellow scientists

An artist's Impression of the victory of the East India Company at the Battle of Plassey on June 23,1757, that laid the foundation of British rule in India

স্বতন্ত্রতার সেনানীরা শুধুমাত্র আত্মত্যাগের প্রতীক নয়, একই সাথে তারা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বও বটে। যখনই দেশ ঘৃণ্য আক্রমনের শিকার হয়েছিল, তাঁরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে

ধরে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তারা বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর দেশের উজ্জল ভবিষ্যত কল্পনা করেছিলেন। এই বোধ অনেক চর্চা ও চিন্তা ভাবনার মধ্যদিয়ে নির্মাণ

হয়েছিল। এই মহৎ বোধকে সঠিকভাবে বুঝলে ও হৃদয় থেকে অনুধাবন করতে পারলেই এই অমৃত মহৎসবের সার্থকতা। স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রতি ভাবনা ও বধির যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আজ খুবই প্রয়োজন শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের নির্মাণ কাজেও প্রয়োজন। বহুযুগ ধরে আমাদের দেশ এক অজস্র সম্ভাবনার ও অমিত স্বর্নালী ভবিষ্যতের দেশ হিসেবে বিবেচিত হতো যার কারণ ছিল দেশের বিপুল সম্পদ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। সারা পৃথিবীর জ্ঞান-অন্বেষীরা আমাদের দেশে এসেছে সত্যের সাধনা করতে। কিছু লোভী স্বার্থপর মানুষ জ্ঞান ও বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশকে শেষ করতে চেয়েছিল। এই নেতিবাচক শক্তির অহরহ আক্রমণে দেশ পরাধীনতার জালে নিখিপ্ত হয়।

ইতিহাসের গতি প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে তিনটি বিশেষ বিষয় কাজ করে কোনো দেশকে কুক্ষিগত করার কাজে - প্রথমটি, শাসন করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা, দ্বিতীয়টি, এক পাশবিক পাগলামি, তৃতীয়টি, নিজ ধর্মের গ্রন্থাগার তৈরি ও দেশের গ্রন্থাগার লুটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড নষ্ট করার প্রবল আগ্রহ। অন্যান্য আক্রমনকারীদের মধ্যে ব্রিটিশদের নিজস্ব কিছু লক্ষ ছিল। তারা কিছু বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা সেই লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছিল। ঠিক এই সময়ে ইংল্যান্ডে প্রবলভাবে বিজ্ঞান সাধনা শুরু হয়। ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার ও স্থায়ীরূপে আমাদের দেশে ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপনের পেছনে ছিল 'বিজ্ঞান শক্তির প্রয়োগ'। এই বিজ্ঞানশক্তি প্রয়োগের কারণে অন্যান্য শক্তির তুলনায় ব্রিটিশ রাজের স্থায়িত্ব ও তীব্রতা সর্বাধিক ছিল।

১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজের উত্থান ঘটে। ইংল্যান্ড এর শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভিক সময়ের প্রায় একই সাথে এই ঘটনা ঘটেছিল। ইংল্যান্ড, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব অর্জন করে। এই অর্থই ইংল্যান্ড এর শিল্প বিপ্লবের মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদও নিয়োজিত হয়েছিল শিল্প বিপ্লবের আয়োজনরূপে। সাল যখন ১৭৫৭, খুব দ্রুত গতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের কাজ প্রারম্ভ করে। ১৯০ বছরের ইতিহাসে ইংল্যান্ড প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন মূল্যের ধন-সম্পদ আমাদের দেশ থেকে লুট করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র সম্পদ আহরণ করাই ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল না। 'দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার' বইটিতে ব্রিটিশ রাজশক্তির গভীরতম উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম ভলিউমের ভূমিকায় এডিটর ইন চীফ রজার লুই লিখেছেন, - মেকলে উদ্ধত ব্যাক্তি হলেও তিনি একজন সত্য ব্রিটিশ অনুগামী। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ রাজশক্তির সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও তা প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বা অনান্য ব্রিটিশ শাসিত স্থানে কিভাবে সুপ্রভাব ফেলেছিল। ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সম্পর্কিত যে মিনিট লেখা হয়েছিল আসলে তা সঠিক অর্থে ছিল ব্রিটিশদের ভারত শাসনের রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা। অতি অল্প তথ্য ও তত্ত্বের সহায়তায় আমাদের দেশের মানুষদের এটা বিশ্বাস করানো কঠিন। এক বিশেষ শ্রেণীর তাত্ত্বিক মানুষের প্রয়োজন যারা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন যে, আমাদের মধ্যে যারা শাসন করে তাদের মধ্যে বিশেষ করে যারা বর্ণে ভারতীয় হলেও মতামতে ও নৈতিকতায় ব্রিটিশ পন্থী । মূল কথা এটাই যে , যে কোনো ভারতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার ভারতীয় পরিচয় মুছে দেওয়া এবং ব্রিটিশ আদর্শকে রোপণ করা এটাই আসলে ছিল তাদের ভারতীয় বোধের উপর আক্রমণ। এই ভারতীয় বোধের উদযাপন করার শ্রেষ্ঠ পথ হল বিজ্ঞানসাধনা।

ব্রিটিশ রাজশক্তি মনে করত : তাদের যুক্তি-নির্ভর বিজ্ঞান প্রযুক্তির মূলে রয়েছে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্ব আরও জোরদার হয় শোষিত জাতি কে নিচু জাতির তকমা দানের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ রাজশক্তি মনে করত ভারতবাসী অসভ্য, বর্বর ও সম্পূর্ণ কুসংস্কারে ডুবে থাকা একটি জনজাতি। বিখ্যাত লেখক অনিশ নন্দী ভারতীয় বিজ্ঞানমনস্কতার উপর এই চরম আঘাত সম্পর্কে বলেছেন , "পাঠকের এটা মনে হতে পারে সেই সময়ে বিজ্ঞান চর্চার নামে আসলে ব্লাক ম্যাজিক এর চর্চা হয়েছিল যা এশিয়া আফ্রিকার জনজাতিকে প্রভাবিত করেছিল । ঔপনিবেশিকতাবাদকে সভ্যতর রূপ দেবার কাজ শুরু হল পশ্চিমী বিজ্ঞান ও কুসংস্কার সংঘাতের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি কাজেই বিজ্ঞান কে ব্যবহার করা হয়েছিল এমনকি ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব লুণ্ঠন করা হয়েছিল বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এটি ভারতীয়দের মূলে ভয়ংকরভাবে আঘাত করেছিল যার ফলে অস্তিত্বের সংকট জেগে উঠেছিল। ফলত, সকলেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে"।

বিজ্ঞানক্ষেত্র থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছিল। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সহ সকল চিকিৎসক ও বিজ্ঞান অনুরাগী ব্যক্তিরা এই একাধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে অনুভব করেছিলেন এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠান তৈরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তারই প্রেরণায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠিত হয় যা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন জাতির পুনর্গঠনে বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশীয় বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ এর উদ্ভাবন সম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন প্রভাব ফেলেছিল যা সমগ্র ব্রিটিশ চেতনাকে নাড়া দিয়েছিলো। IACS এর স্বনামধন্য ও স্বদেশী চেতনা উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানীরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিল – তাদের মধ্যে একজন সি.ভি.রমন, যিনি 1930 সালে সর্বপ্রথম এশীয় হিসেবে বিজ্ঞানে নোবেল পান। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসের অনন্যতম নাম। তার জ্ঞান ও নৈপুণ্য দ্বারা তিনি পাশ্চাত্যকে বিস্মিত করেছিলেন। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সত্যাগ্রহতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে (১৮৮৪) তিনি পদার্থবিদ্যার পাঠদানে আগ্রহী হয়েছিলেন । তার বিজ্ঞানের একদিকে ছিল ব্রিটিশ মেধা ও অন্যদিকে ছিল ভারতীয় শিক্ষাবোধ। দায়বদ্ধতার কারণে ভারতীয় মেধাকে অনেক কম বেতনে কাজ করতে হতো। যদিও লর্ড রিপনের একান্ত ইচ্ছায় তিনি অফিসিয়েটিং প্রফেসর হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল 'ইমপেরিয়াল এডুকাশনাল সার্ভিস' এর মধ্য দিয়ে তার বিরোধীতা করে বলেছিলেন যে, ভারতীয় মেধার মধ্যে সঠিক বিজ্ঞান চেতনার জাগরণ ঘটেনি। অফিসিয়েটিং হবার কারণে তার বেতন আরও কমে গিয়েছিলো। বসু এরপরই সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তার জীবনকার Patrick Geddes বলেছেন "প্রথম দিন থেকেই তিনি তার কাজ সম্পর্কে সচেতন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন কিন্তু একই সাথে তিনি ভারতীয় প্রফেসরদের উন্নতির জন্য প্রচেষ্ঠ ছিলেন। অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে তিনি এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এই

কারণে তিনি তিন বছর কোনও বেতন গ্রহণ করেননি। ব্রিটিশ শক্তি হার মেনেছিল তার এই অদম্য জেদের কাছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিভাজন রোধের ক্ষেত্রে বসু জয়ী হয়েছিলেন"।

A painting of JC Bose by one of modern India's most well known artists, Bikash Bhattacharjee (1940-2006)

তিনি এমন সময়ে তার গবেষনার কাজ শুরু করেছিলেন যখন ব্রিটিশ সরকার আইনকানুন এর পরিপন্থী ছিল। কিন্তু প্রতিকূলতা তার বিজ্ঞানচেতনা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা খর্ব করতে পারেনি। বরং প্রতিকূলতা তাকে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল। ১৮৯৫ সালে তিনি বেতার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ আবিষ্কার করেছিলেন। বোসের এই আবিষ্কারে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবীণ মুখ লর্ড কেলভিন চমৎকৃত হয়েছিলেন। বোস নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র নির্মাণের জন্য বিজ্ঞানসেবা করেননি, করেছিলেন বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতীয়রা যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে সেই সক্ষমতাকে বিশ্বসম্মুখে তুলে ধরার কাজে। তিনি একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখতেন যা প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চেতনাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সেবা করবে। বিজ্ঞান গবেষনার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা তিনি দেশের হৃত গৌরব উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবোধে পরিপুষ্ট জগদীশ চন্দ্র বসু আধুনিক বিজ্ঞানে নিজ স্বাক্ষর রাখতে সফল হয়েছিলেন।

এমনই আরেক মহান বিজ্ঞানী, বোসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিও দেশের হৃত ও গৌরবকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞান গবেষনার মধ্যে দিয়ে, তার নাম আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ভারতীয়দের অবগহিত চেতনাকে জাগ্রত করার স্বার্থে তিনি বই লিখলেন 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' । তিনি দেখলেন প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান কিভাবে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রকে প্রভাবিত করেছে।

Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works Ltd.

দেশের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা দৃঢ় করতে তিনি এক স্বদেশীভাব পুষ্ট বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, যার নাম বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্ক্স (১৯০১)। তিনি বিশ্বাস করতেন , কোনও নবজাগরণ সম্ভব নয় যদি বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পচেতনার সঠিক জাগরণ না হয়। একই সাথে তিনি বিপ্লবীদের বিস্ফোরক তৈরীর শিক্ষাও দিতেন। ব্রিটিশ প্রশাসন তাকে বিজ্ঞানী মুখোশের আড়ালে এক বিপ্লবী বলে বিবেচিত করতেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সকলেই একপাহাড় সমান, তারা সৃষ্টিশীল লড়াই করেছিলেন বিজ্ঞানক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা অর্জনের জন্য। খুবই কঠিন তাদের অবদানকে মুল্যায়নকরা। তাদের অবদানই বলে দেবে স্বতন্ত্রতার অভিমুখে তাদের অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা। বিজ্ঞানী যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এর মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র ভারতীয় বোধকে গড়ে তোলা সম্ভব।
তাদের স্বপ্ন ও সংগ্রামকে অনুভব করে তা বাস্তবায়িত করতে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে।

ভারতের ব্রিটিশ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞান

Debobrat Ghose

১৭৫৭ সালে পলাশিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ জয়ের মধ্যে দিয়ে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি করেছিল । আইরিশ রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক এডমণ্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) বলেছিলেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আসলে ছিল ‘বনিকের ছদ্মবেশে একটি রাষ্ট্র’।

এটা শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুধুমাত্র ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য তৈরি করা হবে। ঔপনিবেশিক শাসকরা যখনই যে কোনও উন্নয়ন নিয়ে এসেছিল, তাদের মনে কেবল ব্রিটিশ স্বার্থ ছিল এবং তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিটি বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়েছিল। যদিও স্বাধীনতার পরেও ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধাগুলো তুলে ধরার কাহিনীটি অব্যহত ছিল যা ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সন্ধিক্ষণ : ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, একটি বণিক সংগঠন – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (EIC) – রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলায় দিওয়ানি অধিকার অর্জন করে। ব্যবসায়ীদের এই সংগঠনটি লন্ডনের একটি বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ক্রমশই এই সংগঠনটি গৌরবময় মুঘল সাম্রাজ্য যা ধ্বংসোন্মুখী তাদের সমান ক্ষমতা অর্জন করে। ১৭৫৭ সালের পূর্বে বাংলায় অতিরিক্ত অর্থের ভারসাম্য বজায় ছিল এবং তার রপ্তানী আমদানিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পর, ১৭৫৭-৮০ সময়কালে, শিল্প বিপ্লবকে ইন্ধন দিতে এবং বেশ কিছু যান্ত্রিক উদ্ভাবনকে সমর্থন করার জন্য বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং পাচার করা হয়েছিল। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ব্রিটিশরা যে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতকে শোষণ করার জন্য তারা নাগালের প্রতিটি উপায়ই নিযুক্ত করেছিল এবং তাতে উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সর্বশেষ হাতিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল যা সময়ের সাথে সাথে ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবকে শক্তিশালী করছিল। ভারত শোষণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান।

প্রতিষ্ঠানগত শোষণ : এটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে পলাশীর যুদ্ধের এক দশকের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নামক সেমিনাল ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে উপমহাদেশের নৃতাত্বিক ও ভৌগলিক অবস্থানের উচ্চাভিলাষী প্রকল্প শুরু করেছিলেন। রাজস্ব বাড়াতে এবং তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এর জন্য প্রশাসনিক ও সামরিক বাবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি ও নৌ চলাচল পথ জারি করার জন্য তাদের একটি পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৭ সালে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর দিওয়ানির অধিকার পাওয়ার পর মেজর জেমস রাননেল বাংলার সার্ভেয়ার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন।

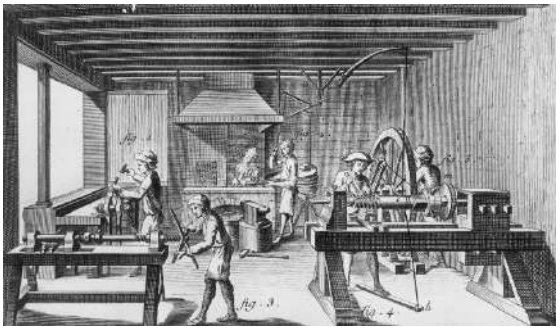

উপমহাদেশের প্রথম ব্রিটিশ ইন্সটিটিউট এর নাম ‘সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’ – এখানে শাসন ক্ষমতার সমস্ত আড়ম্বর ছিল, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল কারণ, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোনও সরকার ছিল না এটি ছিল একটি বনিক সংস্থা। এটি স্পষ্টভাবেই ব্রিটিশদের উচ্চকাঙ্খা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উপমহাদেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থির অবস্থা EIC এর কাছে একটি দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করেছিল এবং তারা পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক উপায় দখল করে নেয় যার মধ্যে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ছিল সর্বপ্রথম। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মাধমে EIC সমগ্র উপমহাদেশের মানচিত্র তৈরি করে পরিমাপযোগ্য জ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে – দক্ষতার সাথে ভারত জয় করার এবং পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এটিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে , বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে বিভিন্ন ধরনের ট্রোপোগ্রাফিকাল, জ্যামিতিক, সামরিক এবং রাজস্ব জরিপ পরিচালিত হয়েছিল।

এই সময় ব্রিটিশরা দেশে তাদের উচ্চকাঙ্খা পূরণের জন্য সেকন্ডহ্যাণ্ড যন্ত্র সহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চালু করেছিল। ১৮০০ সালে সেকন্ডহ্যান্ড যন্ত্র সহ ভারতীয় উপদ্বীপের ত্রিকোনমিতিক জরিপ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৮ সালে অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধে, মারাঠাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর সাতলজ নদীর দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণনে চলে আসে। ১৮১৮ সালে ব্রিটিশরা ভারতের ত্রিকোনমিতিক জরিপ এর নামকরণ করে ‘গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’(GTS) রাখে। ট্রান্স-হিমালয় অঞ্চল সহ পুরো দেশ এর অন্তর্ভূক্ত। খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ হিমালয় অঞ্চলের জরিপ করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

GTS বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা (PEAK XV) গণনা করে এবং এর পিছনে ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল নায়ক ও তরুণ ভারতীয় গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার, যিনি কম্পিউটার পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু শিকদারকে কোন কৃতিত্ব না দিয়ে সার্ভেয়ার জেনারেল

জর্জের নামানুসারে এভারেস্ট শিখর এর নাম করা হয় 'মাউন্ট এভারেস্ট' হিসেবে। এটি অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটি, যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বৈষম্যমূলক নীতির জন্য তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

ভারত থেকে সম্পদ লুট করা হোক বা বিজয়ী প্রশংসা, ব্রিটিশরা জাতিকে শোষণ করার জন্য বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করত। এটা ছিল ভারতের দেশীয় বিজ্ঞান এবং মূল্যবান ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পন্ন কাজ। লক্ষ্য পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল ভারতের দেশীয় বিজ্ঞান এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী সহ যারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত তাদের বদনাম করা। বৈজ্ঞানিক মেজাজ এর অভাব ছিল বলে ব্রিটিশরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বদনাম করা হতো।

ভারতীয় রেলওয়ে মারফত ভারতবর্ষের লুট : ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল, তারিখটি আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা রয়েছে কারণ সেইদিন ব্রিটিশদের সৌজন্যে ভারতে প্রথম রেল চলাচল শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতে রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কারণ তারা বুঝতে পারে সারা দেশ থেকে কয়লা, লোহা, তুলো এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ইংল্যান্ডে দ্রুত পরিবহন, উন্নয়ন এবং শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন।

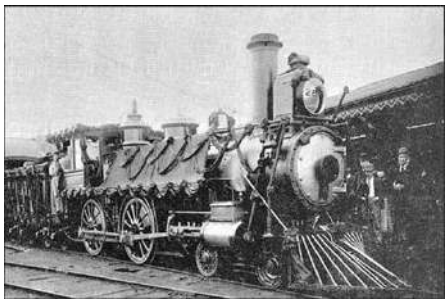

সর্বপ্রথম রেললাইন তৈরি হয় ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি শহরের বন্দর গুলিতে, বম্বে এবং মাদ্রাজে, মধ্যভারতের শাহডোলের কয়লা সমৃদ্ধ বেল্ট অথবা ছোটনাগপুর (এখন ঝাড়খন্ড) প্রভৃতি অঞ্চলে। ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছাড়া মানুষের চলাচল ছিল খুবই কম। ভারতীয়দের জন্য একমাত্র কাঠের বেঞ্চ সহ তৃতীয় শ্রেণীর বগি বরাদ্দ ছিল।

একটি মিথ তৈরি হয়েছিল যে, রেলপথ ছিল ব্রিটেনের তরফ থেকে ভারতের জন্য উপহার, এবং দুর্ভাগ্যবশত এই ভাবনা এখনো অনেকেই বিশ্বাস করে।

বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার রেলপথ, যেটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার নিজের ব্যবহারের জন্য করেছিল। ১৮৪৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিংজ যুক্তি দিয়েছিলো যে রেলওয়ে সরকার, বাণিজ্যে এবং দেশের সামরিক নিয়ন্ত্রণ এর জন্য উপকারী হবে।

ব্রিটিশ শেয়ার হোল্ডাররা এই বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার ব্যবহার করে রেলওয়েতে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ করেছিল। সরকার সেসব শেয়ারের দ্বিগুন ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলো যেগুলো কিনা পুরোপুরি ভারতীয় করদাতাদের কাছ থেকে পাওয়া, ব্রিটিশদের খাজনা নয়। এটিও ছিল তাদের অসংখ্য কেলেঙ্কারির মধ্যে একটি।

এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকে, রেলওয়ে বোর্ডের পরিচালক, রেলের প্রধান কর্মচারী থেকে টিকিট সংগ্রাহকদের সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়। তারা সবাই ইউরোপীয় বেতন স্কেলের সমান বেতন ভুক্ত কর্মচারী।

আরেকটি উদাহরণ প্রমাণ করবে কিভাবে ব্রিটিশরা নিজস্ব সুবিধার জন্য ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টাকে দমন করে। ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ১৮৬২ সালে বাংলার জামালপুরে এবং রাজপুতানার আজমিরে রেলের কর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু ভারতীয় যন্ত্রবিজ্ঞান এত দক্ষ ছিল যে ১৮৭৮ সালে তারা নিজস্ব লোকোমটিভ ডিজাইন নির্মাণ শুরু করে । যেহেতু ভারতীয় লোকোমটিভ ছিল ব্রিটিশদের তুলনায় সমানভাবে ভাল এবং অনেক সস্তা তাই তাদের সাফল্য ব্রিটিশদের মনে ভয় সৃষ্টি করে। এই প্রচেষ্টাকে কুঁড়িতেই বিনষ্ট করার এবং লোকোমটিভ নকশা উৎপাতন কর্মশালা ভারতীয়দের জন্য অসম্ভব করে তোলার জন্য ১৯১২ সালে ব্রিটিশরা পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে । ১৯১২ এর পর কোন লোকোমোটিভ নির্মিত হয়নি। ১৮৫৪-১৯৪৭ সালের মধ্যে, শুধুমাত্র ইংল্যান্ড থেকে ভারতে প্রায় ১৪,৪০০ লোকোমোটিভ আমদানি করা হয়েছে।

ল্যাবের এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্য উদ্দেশ্য : ১৭৮৭ সালে EIC এর একজন সেনাধিকারিক কর্নেল রবার্ট কিড, কলকাতার হাওড়ায় শিবপুরের কাছে বোটানিকাল গার্ডেন (বর্তমানে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতীয় বোটানিক উদ্যান) প্রতিষ্ঠা করেন। বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপনের পিছনে একটি স্বার্থপর উদ্দেশের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বা বানিজ্যিক উদ্ভিদ বা ঔষধ সম্পর্কিত বিষয়ে

কোম্পানীর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাদের এক এবং একমাত্র আগ্রহ ছিল কাঠ সংগ্রহ করা এবং কলকাতার বাইরে চালানোর জন্য মালবাহী জাহাজ নির্মাণ করা। বার্মা থেকে চড়া দামে তাদের সেগুন কাঠ কিনতে হতো। বাগানটিকে সেগুন কাঠ উৎপাদনের একটি বিকল্প জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

ভারতের অর্থে ব্রিটিশদের সম্মান অর্জন : ঔপনিবেশিকতা হল আধিপত্বের রীতিপদ্ধতি। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের উপর এটি কার্যকর করতে কোনো উপায় বাকি রাখেনি। আধুনিক ইতিহাসে তারা প্রথম শিল্পায়িত জাতি হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে কিন্তু কার খরচে? ভারতে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক মনোভাব কী সত্যিই অনুপস্থিত ছিল? ব্রিটিশরা মিথ্যাপ্রচার করেছিল যে ভারতীয়রা কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের মতে ভারতীয়দের মধ্যে যৌক্তিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ এর খুবই অভাব ছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান হিসেবে ধরা হয়েছিল। পশ্চিম বৈজ্ঞানিক কতৃপক্ষ দ্বারা তাদের পদ্ধতির মাধ্যমে বৈধ না হলে এটি বিশ্বাস করা যাবেনা। শিল্পবিপ্লবের উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হিসেবে সম্পদ টানতে ভারতীয় বাজারকে আরেকটি চ্যানেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভারতের সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ এই প্রশংসা উপার্জনে ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রভাব : ১৬০০ সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন ব্রিটেন বিশ্বের জিডিপির মাত্র ১.৮% উৎপাদন করেছিল এবং ভারত প্রায় ২৩% (১৭০০ সালের মধ্যে এটি ২৭% হয়) উৎপাদন করে। ১৯৪০ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন এর প্রায় দুই শতাব্দীর পড়ে ব্রিটেন বিশ্ব জিডিপির প্রায় ১০% এ উপনীত হয়, যদিও এইসময় জনসংখ্যার ৯০% দরিদ্রসীমার নিচে বাস করা ভারতীয়, দরিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ এর সঙ্গে ভারত বিশ্বের তৃতীয় দরিদ্রতম দেশ হয়ে গিয়েছিলো এবং এই কাজ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই করা হয়েছিল। কয়েক হাজার পুরোনো যেই সভ্যতা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অগ্রণী আবিষ্কার, কারুশিল্প, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতকে ব্রিটিশ শাসন নিষ্কাশন করেছে ও একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে ফেলে রেখে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজস্ব বড়দের সভাপতি জন সুলিভান এর পর্যবেক্ষন অনুযায়ী : "আমাদের সিষ্টেম কাজ করে অনেকটা স্পঞ্জের মত, সবগুলো বাছাই করা ভাল জিনিস গঙ্গার তীর থেকে নিয়ে টেমস নদীর তীর-এ বর্ষণ করা"।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের কণ্ঠরোধ

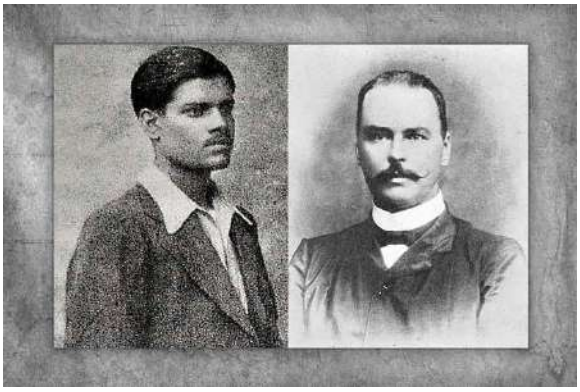

Sir Ronald Ross (right) who won the 1902 Noble Prize for Medicine for his discovery of malaral parasite, never acknowledge the contribution of his research assistant Kishori Mohan Bandyopadhyay (left)

Prof. Ranjana Aggarwal

ব্রিটিশ নীতিগুলো দ্বারা ভারতে যে বৈজ্ঞানিক বৈষম্য আনা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক, কিন্তু এটি শুধুমাত্র দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ইন্ধন জুগিয়েছে।

ইতিহাসই আমাদের জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে সত্য খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। যে মহান সভ্যতা তার গৌরব হারিয়েছে , সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ সেই ইতিহাসই আমাদের সত্য খুজে বের করতে সাহায্য করবে।

আমাদের দেশ যখন স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তী বছর দারুন উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করছে, তখন আমাদের অতীতকে পুনরায় সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ইতিহাসের চিত্রণ স্মরণ করা প্রয়োজন। বৈদিক যুগ থেকে আমাদের দেশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শক্তিশালী ঐতিহ্যের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবা করছে। সমগ্র মানবতার কল্যাণ ছিল এর শিকড়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধুনিক গবেষণাগার স্থাপনের আগে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে (বিশেষ করে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং ঔষধ) সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছিলেন। । একটি প্রবাদ বছরের পর বছর ধরে নির্মিত হয়েছিল যে, উপনিবেশিক স্থাপনের পূর্বে ভারতের কোনো উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান ছিল না এবং এটি খুবই বিদ্রুপাত্মক । বিজ্ঞান, যার উৎপত্তি ও বিকাশ ছিল ইউরোপে শুধুমাত্র উপনিবেশিক ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতে চালু করা হয়েছিল ।

পশ্চিমের বিজ্ঞানের ভারত আগমন : তিক্ত সত্য হল এই যে, ব্রিটিশরা বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তারা ভারতের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ ভালোভাবে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ আর দক্ষ পদ্ধতিতে শোষণ করে। বৈজ্ঞানিক সমাজ অথবা বৈজ্ঞানিক শাখার প্রচারের কোন প্রতিশ্রুতি তাদের ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করা। আদি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং উপনিবেশিক বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। তীব্র বৈষম্য সত্ত্বেও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা যারা তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং উপনিবেশের সময়কালে জাতীয়তাবাদের উত্থানে অবদান রেখেছেন তাদের কিছু উজ্জ্বল কাহিনী তুলে ধরাই এই নিবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

যদিও ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এর সাথে পরিচয় হয়েছিল জরিপকারী এবং তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে বা পরীক্ষাগার সহকারী হিসেবে কিন্তু তারা শীঘ্রই তাদের নিজস্ব বিজ্ঞানের ব্যবহার করে সারা ফেলে দেন। তারা নিজেদের ভারতীয়দের উন্নতি সাধনে নিমজ্জিত করে। তাদের প্রভুদের কাছে তাদের অবদানের কোনো গুরুত্ব ছিল না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ক্লাবে ভারতীয়রা ছিল নাম পরিচয়হীন পরিচারক হয়ে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের বর্ণবৈষম্য নীতি : এই ধরনের অজ্ঞাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাধানাথ শিকদার একজন উজ্বল গণিতবিদ ছিলেন। উনি "স্ফেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রি" বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ভারতের গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিটিএস)-তে কম্পিউটার হিসেবে কাজ করেন। তখন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা Peak XV গণনা করেছিলেন। স্যার অ্যান্ড্রু ওয়া যিনি শিকদারকে কৃতিত্ব না দিয়ে তার পূর্বসূরী সার্ভেয়ার জেনারেল জর্জ এভারেস্ট এর নামে এই শিখরের নামকরণ করে মাউন্ট এভারেস্ট রাখার প্রস্তাব দেন।

Radhanath Sikdar

এটা অত্যন্ত কৌতুহলুদ্দীপক যে ভারতের জন্য জরিপের মানুয়ালের (ক্যাপ্টেন এফ স্মিথ ও ক্যাপ্টেন এইচ এল থুলিয়ার দ্বারা সম্পাদিত) প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে রাধানাথ সিকদারের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় তখন ঔপনিবেশিক শাসকরা অসাবধানতাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে GTSI প্রকাশনার কম্পিউটিং বিভাগের প্রধান এর নাম মুছে ফেলেছেন। তারা জানত যে মৃত মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেনা। কিন্তু এই ঘটনাটি অলক্ষিত ছিল না। ১৮৭৬ সালে "ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া" নামক একটি সংবাদপত্রে এই ঘটনাটিকে "Robbery of the dead" বলে অভিহিত করা হয়েছে। একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট যিনি জরিপ বিভাগের কর্মীদের 'পাহাড়ী কুলি' বলে আপত্তিকর মন্তব্য ব্যবহার করেছিলেন, শিকদার ব্রিটিশদের সেই আচরণে প্রতিবাদ করে এক দৃষ্টান্তমূলক ও নৈতিক সাহস প্রদর্শন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসকরা তার এই 'অপরাধমূলক' কর্মের জন্য তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করেছিলেন কিন্তু দেশবাসীর কাছে তিনি নায়ক হিসেবে প্রশংসিত হন। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ পন্ডিতরা তাদের সফল্য অর্জনের জন্য ভারতীয় প্রতিভার সাহায্য নিয়েছিল কিন্তু তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করতে অস্বীকার করেন। ১৯০২ সালে মালেরিয়ার পরজীবী আবিস্কারের জন্য স্যার রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পান। এই পুরো গবেষণা তিনি ভারতে সম্পাদিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার নোবেল বক্তৃতা বা তার গবেষণাপত্রে কোথাও তরুণ উজ্জ্বল গবেষণা সহকারী, কিশোরী মোহন বন্দোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা উল্লেখ করেনি।ভারতের এই তরুণ বিজ্ঞানী যিনি প্রেসিডেন্সি থেকে বিজ্ঞান স্নাতক এবং পরীক্ষাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কিশোরী মোহনকে তার অবদানের স্বীকৃতি এবং সম্মান জানাতে উপেন্দ্রনাথ ব্রম্মোচারী , আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং অন্যরা লর্ড কার্জনকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনকে যখন দিল্লীর দরবারে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড -এর স্বর্ণপদক "ডিউক অফ কন্নৌট" দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি এই বিষয়টি দেখেছিলেন। ১৯২৩ সালে যখন রস তার স্মৃতিকথায় মালেরিয়ার সমস্যা ও তার সমাধান প্রকাশ করেছিলেন তখন তার নাম উল্লেখ না করায় বন্দোপাধ্যায় দারুন হতাশ হয়েছিলেন। কয়েক যায়গায় তিনি তার সহকারীর কথা বলেছেন, কিন্তু নামে নয়। ১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল প্রদর্শন করার সময় তিনি রস এর সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানিদের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব ছিল প্রতারণামূলক। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ডঃ উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসসির অধীনে টেলিগ্রাফিক লাইন ইন চার্জ পরিদর্শক শিবসুন্দর নন্দী কলকাতা ও বম্বের মধ্যে প্রকৃষ্ট টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পাদন করে ব্রিটিশ সরকারের সেবা করেছেন। যখন ডঃ ও'শনেসসি টেলিগ্রাফের অধিকর্তা হন তখন দুই ইংরেজ, সুপারিটেণ্ডেন্ট এবং সহকারি হিসেবে নিযুক্ত হন কিন্তু নন্দী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখালেও ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ চালিয়ে যান। এখানে লক্ষ্য করা বিষয় হল এই ,ব্রিটিশ সরকার পেশাগতভাবে তাকে উন্নীত করেননি কিন্তু সামাজিক স্তর বিন্যাসে তাকে রায় বাহাদুর এর মত সম্মানে সন্তুষ্ট করেন। এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যেখানে দেখা গেছে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যারা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় এর স্বনামধন্য বিজ্ঞানী তারাও বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন। একই গ্রেড এবং পদমর্যাদার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ইউরোপীয়দের তুলনায় নিম্নতর কর্মচারীর পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় ব্রিটিশরা মনে করতো, শিক্ষাবিষয়ক কাজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা ভারতীয়দের ছিলনা তাই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্বেও Imperial Educational Service (IES) তাদের জন্য বন্ধ ছিল। IES শুধুমাত্র মনোনয়নের মাধ্যমে প্রবেশযোগ্য ছিল।

এই নীতিটির মাধ্যমে ইউরোপীয়রা শিক্ষা বিভাগে স্থান পাওয়ার সুবিধা পেয়েছিল কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রাদেশিক শিক্ষা পরিষেবায় (PES) থাকতে হতো, যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের IES দের অর্ধেক বেতন দেওয়া হত।

ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া : বিজ্ঞানের এই 'বর্ণবৈষম্য' ভারতীয়দের মধ্যে কড়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। জগদীশ চন্দ্র বসু প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিদ তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন দ্বারা প্রথম ইমপেরিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু তখন বাংলার পাব্লিক ইন্সট্রাকশন পরিচালক স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্ট এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস আর টনি এর তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। ক্রফ্ট বলেছিলেন, "আমার কাছে এখানে বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর কোনও নিয়োগ নেই আমি আপনাকে শুধুমাত্র প্রাদেশিক পরিষেবায় একটি জায়গা দিতে পারি যেখান থেকে আপনার পদোন্নতি হতে পারে"। এমনকি লর্ড রিপনের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের পরেও তাকে অর্ধেক বেতন এর সঙ্গে একটি অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। বোস প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেটি ছিল ঔপনিবেশিক সময়ের প্রথম সত্যাগ্রহ। জগদীশ চন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সিতে তিন বছর ধরে তার শিক্ষা দানের দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন এবং হ্রাসকৃত বেতন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ না রয়াল সোসাইটি বোসকে স্বীকৃতি দেয়, কলেজ কতৃপক্ষ তার যে কোনো গবেষণার সুবিধা অস্বীকার করে এবং তার কাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত হিসেবে বিবেচনা করে। অবশেষে কতৃপক্ষ বোসের শিক্ষকতা দক্ষতার মূল্য পুরোপুরিই উপলব্ধি করেন এবং তার নিয়োগ স্থায়ী করা হয়, এমনকি তার তিন বছরের বাকি বেতনও পূরণ করা হয়েছিল।

আরেকজন বিখ্যাত রসায়নবিদ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ও একইভাবে বৈষম্য সহ্য করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করে ফেরার পর তাকে এক বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং অবশেষে তাকে একটি অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অপরপক্ষে এইরকম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারি ব্রিটিশ রসায়নবিদরা অবিলম্বে রাজ্যের সচিব দ্বারা IES কর্মচারীর পদে নিয়োগ করা হয়। আচার্য্য প্রফুল্ল রায় যখন এই অসম আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করলেন তখন ব্রিটিশরা প্রতিক্রিয়ায়ব লেন, "জীবনের অন্যান্য পথ খোলা আছে আপনাকে কেউ এই নিয়োগ মেনে নিতে বাধ্য করেনি"। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে রায়ের মত একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিকে ব্রিটিশরা "একজন বিজ্ঞানীর পোশাকে বিপ্লবী" হিসেবে উল্লেখ করেছে।

GSI-এর প্রধান এইচ বি. মেডলিকটের মতে, ভারতীয়রা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনও মৌলিক কাজ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। রয়াল স্কুল অফ মাইন্স, লণ্ডন -এর একজন দক্ষ ভূতত্ত্ববিদ, প্রমথ নাথ বসুকে বাতিল করে তার দশ বছরের জুনিয়র, টি হল্যাণ্ডকে GSI-এর প্রধান করা হয়। এই ঘটনা স্থানীয় ভারতীয়দের প্রতি অবমাননাকর মনোভাব প্রতিফলিত করে। যাইহোক, তিনি একজন জুনিয়র সহকর্মীর

Pramatha Nath Bose

অধীনতা গ্রহণ করবেন না বলে এবং দেশবাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির উল্লেখ করে GSI থেকে পদত্যাগ করেন। তার সমস্ত পূর্ববর্তী ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি যে ব্রিটিশ দ্বারা ব্যবহৃত হবে এ ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই যখন তিনি ময়ূরভঞ্জে সমৃদ্ধ লোহার আকরিক মজুদ আবিষ্কার করেন তখন তিনি এটি স্বদেশী শিল্পপতি, জামশেদজি টাটার নজরে এনেছিলেন। শিল্পপতি, প্রমথ বসুকে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ প্রদান করে। প্রমথ নাথ বসু, তার ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের জ্ঞান বিনিয়োগ করে ভারতের প্রথম লোহা এবং ইস্পাত শিল্প, TISCO (Tata Iron and Steel Company) প্রতিষ্ঠা করেন। একটি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে যে

Seeb Chunder Nandy

কোনও দেশীয় প্রতিভার প্রচেষ্টা চালানো বা স্থানীয় অগ্রগতিতে এটি প্রয়োগ করা ছিল একটি কঠিন কাজ । যদিও এটা মনে হতে পারে যে দেশের বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রতি তাদের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিফলিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান গোখলে, তিলক, ভগত সিং প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে সমানভাবে তুলনীয়। তাদের সংগ্রাম বলতে বোঝায় ভারতে বিজ্ঞানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় এবং এর মাধ্যমে তাদের জাতীয় পুনঃপ্রত্যয়ন। এই বিজ্ঞানীরা, যারা ব্রিটিশদের সঙ্গে বুদ্ধিগত দিক থেকে আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন প্রকৃতপক্ষে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের জন্য দায়ী ছিল। এখন এই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের মুহূর্তে, যখন দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছে তখন সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজকে বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা করা বলিদান স্বীকার করে আমাদের মহান দেশ ভারতের জন্য গর্ব করতে হবে।

জাতীয়তাবাদী বৈজ্ঞানিকদের উত্থান

J.C.Bose with his students at the Bose Institute, Calcutta

Dr. Ruchir Gupta

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের হাতে বৈষম্য এর সম্মুখিন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং দেশের পরবর্তি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে এবং বৈজ্ঞানিক সুবিধা তৈরি করতে সফল হয়েছেন। গত ৫০০ বছরে ভারতের পূর্ববর্তী সকল আক্রমণ থেকে ব্রিটিশদের আক্রমণ ছিল ভিন্ন কারণ তারা আমাদের লুট করার জন্য বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন যেমন ১৭৬৭ সালে 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' এবং তার পরে আরও অনেক যেমন 'জুওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' , 'বোটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইগুলো কোনও গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয় এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ ছিল ভারতবর্ষকে জরিপ করা যাতে ব্রিটিশরা ভারতকে পুরোপুরিভাবে শোষণ করতে সক্ষম হয়। মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্রিটিশরা একটি কাহিনী প্রচার করার চেষ্টা করেছিল যে, ভারতীয়রা যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে পারেনা এবং ফলতই তারা বিজ্ঞান সাধনা করতে পারেনা।

Botanical Survey of India was founded in Calcutta in 1890

এর জবাবে জাতীয়বাদী বিজ্ঞানীরা তাদের পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবহার করে সমাজের সকল স্তরের ভারতীয়রা যাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করে সেটি ভারতের উন্নয়নে ব্যবহার করতে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। তারা বিজ্ঞানকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের অবদান বুঝতে কয়েকজন মহান বিজ্ঞানীর জীবন সম্পর্কে কিছু জানা অপরিহার্য।

ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। ভারতের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্যই এই দেশ এতকাল ধরে নিজের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। ব্রিটিশরা যখন ভারতে এসেছিল, তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে ভারতীয়রা যুক্তিহীন এবং অবৈজ্ঞানিক। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে ব্রিটিশদের ভুল প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানীরা তাদের পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষায় উপলব্ধি করার পর তারা ব্রিটিশদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই শুরু করেন। তারা প্রায় কোনও সমর্থন ছাড়াই তাদের নিজস্ব পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বমানের গবেষণা করেছেন।

তাছাড়া তারা প্রয়োজনীয়ও নির্দেশিকা এবং সুবিধা প্রদান করে উদীয়মান তরুণদের বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক তৈরির জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন। স্যার সি.ভি. রমন ছিলেন এমনই একজন তরুণ বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞান শাখায় সর্বপ্রথম এশিয়ান হিসেবে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। এই প্রচেষ্টায়, আর অনেক ব্যক্তির অবদান আছে যারা সেই হিসেবে বিজ্ঞানী ছিলেন না, তাদের মধ্যে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ভগিনী নিবেদিতা, পন্ডিত মদনমোহন মালভিয়া প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উত্থানের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছেন।

Sir CV Raman, first Asian to win the Noble Prize in Science, with other winners in 1930

মহেন্দ্রলাল সরকার : 1833 সালের ২রা নভেম্বর কলকাতার হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয়। ডঃ সরকার ছিলেন ১৮৬৩ সালের কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে দ্বিতীয় মেডিকেল স্নাতক। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ মেডিকাল অ্যাসসিয়েশনের বাংলা শাখার সভাপতি। গোড়ায় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির কঠোর সমালোচক ছিলেন কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ইংরেজদের ঔষধ ব্যবস্থার চেয়ে বেশি কার্যকর লক্ষ্য করেছেন। তারপর তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে এবং পদ্ধতিগতভাবে হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে চিকিৎসা করলেন এবং এটির পেছনের বিজ্ঞান বুঝতে পারলেন। পড়ে তিনি তার বক্তব্য ব্রিটিশ মেডিকাল কাউন্সিলের একটি বৈঠকে উপস্থাপন করেন। ফলস্বরূপ তাকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়েছিল এবং কাউন্সিলে তার অবস্থান থেকে তিনি অপসারিত হয়েছিলেন।

পড়ে ডঃ সরকার ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রচার এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ১০ বছরের নিরন্তর প্রচেষ্টার পর ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন। IACS ভারতীয়দের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এটি ভারতীয়বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে এবং বক্তৃতা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করে। এই প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য ফল ছিল ১৯৩০ সালে স্যার সি. ভি. রমনের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় : ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট যশোর জেলার কাটিপারা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) আচার্য্য প্রফুল্ল রায়ের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ভারতের একজন সর্বশ্রেষ্ট রসায়নবিদ । চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী । তার বিখ্যাত উদ্ধৃতি ছিল, "বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারবেনা"। জাতির স্বাধীনতায় অর্থনীতির ভূমিকা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন । সেই সময়ে সালফিউরিক

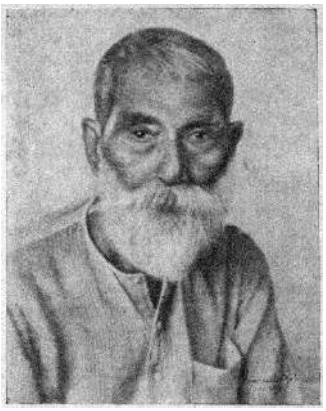

Acharya Prafulla Chandra Ray

অ্যাসিডকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক হিসেবে বিবেচনা করা হত। রায় পর্যবেক্ষণ করলেন যে স্থানীয় নির্মাতারা শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে অ্যাসিড তৈরি করতে পারে, তাই তিনি ভাদুড়ী ভাইদের অ্যাসিড উৎপাদনে সাহায্য করেন। তিনি এছাড়াও আয়রন সালফেট এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট তৈরি করা শুরু করেন। তিনি ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালস নামে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীও শুরু করেন যেটি ভারতে প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী হিসেবে পরিচিত। প্রাচীন রসায়নবিদদের গুরুত্ব অনুধাবন করে, প্রাচীন রসায়নের সংকলন হিসেবে "হিন্দু রসায়ন" নামে তিনি একটি বই লিখেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য ১৯২৪ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির নিজস্ব জার্নাল শুরু হয়। তিনি নিজে গবেষণাপত্র ভারতীয় জার্নালে প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরও প্রকাশ করায় অনুপ্রাণিত করতেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু : জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী যিনি পদার্থবিদ্যা থেকে উদ্ভিদবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তিনি ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জে জন্মগ্রহন করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। পড়ে ফিরে এসে তিনি ইম্পেরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশদের ব্রিটিশদের ধারণা ছিল যে ভারতীয়রা যুক্তিহীন এবং অবৈজ্ঞানিক সেই কারণে তিনি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয়দের গর্বকে সমুন্নত রাখতে, বসু সত্যাগ্রহের পথ ধরলেন এবং বীনা বেতনে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। অবশেষে তিনি ইম্পেরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞানী যে, পরীক্ষামূলকভাবে মাইক্রোওয়েভ -এর প্রেষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এমন অসামান্য কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না এবং পরে গুগলীয়েলমো মারকনি দীর্ঘ দূরত্বে বেতার টেলিগ্রাফ কাজ প্রদর্শনের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১২, বোসের মিলিমিটার ব্যান্ড রেডিওর পরীক্ষামূলক কাজ ইলেকট্রিকাল এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং –এ IEEE মাইলস্টোন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

Acharya Jagadish Chandra Bose

এছাড়াও তিনি বায়োফিজিক্স, উদ্ভিদবিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবিষ্কার করেছেন। তিনি ছিলেন মুক্তজ্ঞান এবং ভারতীয় আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি তার আবিস্কারের জন্য কখনও পেটেন্ট করেননি। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি অনেক কল্পকাহিনীও লিখেছেন। ১৯১৭ সালে তার জন্মদিনে তিনি বিজ্ঞানের অন্তঃবিভাগীয় পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দির নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "আমি আজ এই প্রতিষ্ঠানকে উৎসর্গ করছি – নিছক একটি পরীক্ষাগার হিসেবে নয়, বরং একটি মন্দির হিসেবে। বত্রিশ বছর আগে আমি বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আমার পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছি। অদ্ভুত শরীরের গঠন প্রকৃতি বা নিয়মতন্ত্র দ্বারা ভারতীয় মন সবসময় প্রকৃতির পড়াশোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে আধিভৌতিক অনুমান স্বীকার করে। এমনকি সঠিক পর্যবেক্ষন ও তদন্তের উপস্থিতি অনুমান করা সত্বেও তাদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিল না, এবং ছিল না কোনও সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি ও দক্ষ মেকানিশিয়ান। এই সব ছিল সত্য। এটি মানুষের অভিযোগের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা করা এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং আমরা সেই জাতিভুক্ত যা সহজ উপায়ে মহান জিনিস সম্পন্ন করেছে।

মেঘনাদ সাহা : মেঘনাদ সাহা ছিলেন একজন প্রখ্যাত পদার্থবিদ তিনি ১৮৯৩ সালে বাংলাদেশের ঢাকার নিকটবর্তী শওরাতলী নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো সহকর্মী হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সাহা সমীকরণের জন্যে পরিচিত, যেটি জ্যোতিপদার্থবিদ্যায় নক্ষত্রের স্পেক্টরা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভারতে সহজলভ্যতার জন্য তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সাথে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং হারম্যান মিংকোস্কির আপেক্ষিকতার উপর গবেষণাপত্র অনুবাদ করেন। তিনি একজন জাতীয়তবাদী ছিলেন এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বহু অবদান রেখেছিলেন।

Meghnad Saha

সি ভি রমন : স্যার চন্দ্র শেখার ভেঙ্কট রমন ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ। প্রথম ভারতীয় এবং এশিয়ান হিসেবে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জাতীয়তবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনে, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) –এর ফলস্বরূপ প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে স্যার চন্দ্র শেখর ভেঙ্কট রমনকে বিবেচনা করা যেতে পারে। রমনের জন্ম ১৮৮৮ সালের ৭ই নভেম্বর, তিরুচিরাপল্লীতে। তখনকার দিনে ভারতীয় অর্থ পরিষেবার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকরির পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন এবং সহকারী হিসাব রক্ষক হিসেবে কলকাতায় যোগদান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। সেখানে তিনি IACS -এর সংস্পর্শে আসেন। তিনি তার অবসর সময়ে সেখানে কাজ শুরু করেন। ১৯০৯ সালে IACS, Bulletin of Indian Association for the Cultivation of Science নামে একটি জার্নাল শুরু করেন যেখানে স্যার রমনের বিশেষ অবদান ছিল। রমন IACS এর দিনগুলিকে তার জীবনের সোনালী দিন হিসেবে উল্লেখ করেন। 1934 সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ

সায়েন্স প্রকাশনা শুরু করেন। 1943 সালে তিনি ট্র্যাভ্যানকোর কেমিকাল অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি নামে একটি কোম্পানী শুরু করেন। 1948 সালে তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য ব্যাঙ্গালোরে "রমন রিসার্চ ইন্সটিটিউট" প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং আমরা সহজেই লক্ষ করতে পারি সেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে একটি সর্বাঙ্গিন জাতীয়তাবাদের পরিচালনা করার অবদান রেখেছেন। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান আচ্ছাদিত রয়েগেছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম

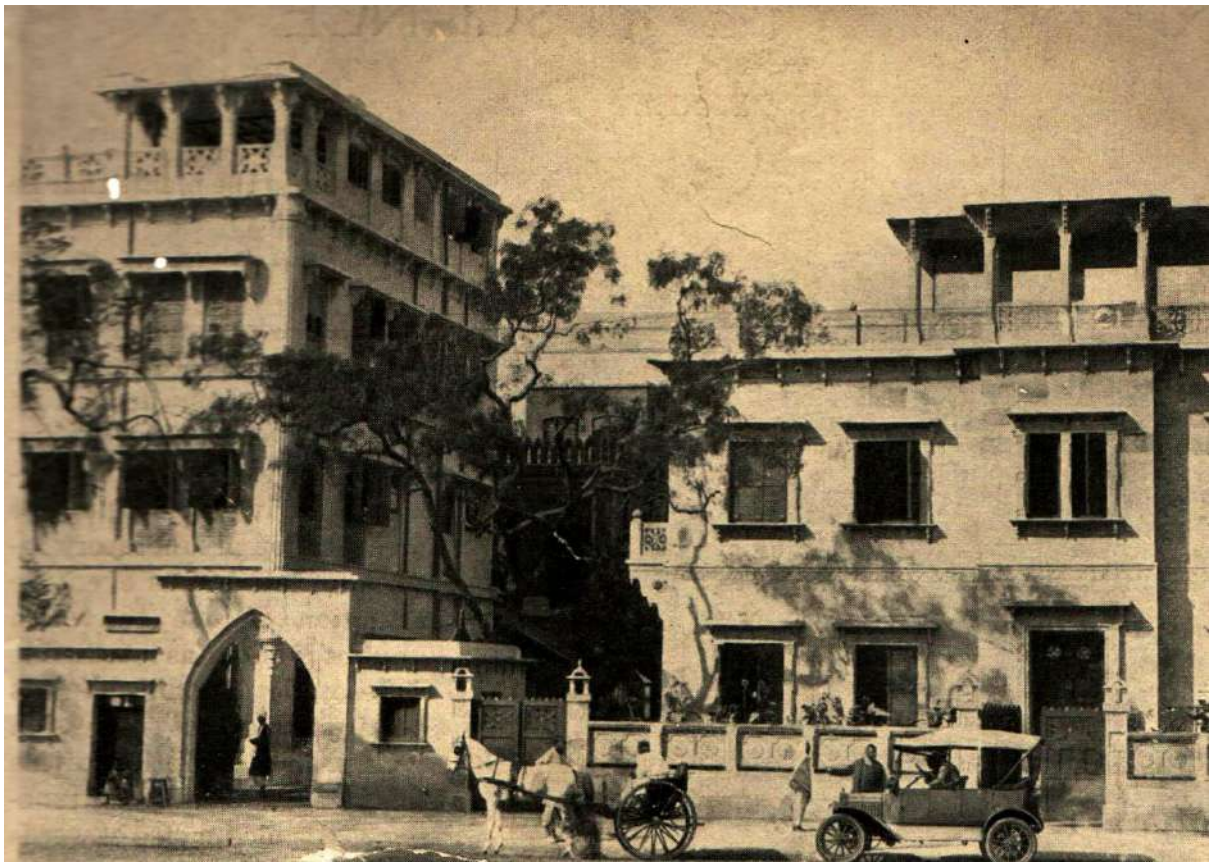

Bose Institute founded by JC Bose in 1917, Calcutta

Dr. Arvind C Ranade

Old building of IACS in Calcutta,
the first science institute founded by an Indian

এটি একটি সুপরিচিত সত্য যে 1608 সালে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ব্যবসায়ী হিসেবে ভারতে আসেন। মুষ্টিমেয় কিছু ব্রিটিশরা ব্যবসায়িক সম্পর্কের ছদ্মবেশে অনৈতিক কৌশল এবং পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতের বিভিন্ন অংশ দখল করা শুরু করে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। 1757 সালে বাংলার নবাবকে পরাজিত করার পর এই কোম্পানী

দেশের শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা শুরু করে। এটা নির্বিচারে পরিচালিত হয় যা চরম অসংতির দিকে পরিচালিত হয় এবং ফলস্বরূপ 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই অস্থিরতা মেটাতে অবশেষে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করেছিল এবং এইভাবে ভারতে ব্রিটিশ রাজ শুরু হয়। ব্রিটিশরা বিভিন্ন আইন কানুনের মধ্যে দিয়ে সরকারের নিম্নপদে অফিস, প্রশাসন, পুলিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগের দ্বারা ভারতীয়দের কিছু অংশকে খুশি করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। এই পন্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি এবং তাদের কর্মপদ্ধতি তাদের প্রকৃত চেহারা স্পষ্ট করে। শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব, বৈষম্যমূলক এবং অমর্যাদাপূর্ণ আচরণ বিজ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ছিল। বর্তমান নিবন্ধটি অজানা সত্য কাহিনীর উপর আলোকপাত করে যেখানে ব্রিটিশ দমন সত্ত্বেও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে।

সুলভ কর্মশক্তি হিসেবে ভারতীয় : ব্রিটিশরা বিজ্ঞান ভিত্তিক সরঞ্জাম যেমন ম্যাপিং ডিভাইস, কম্পাস, ফায়ারগ্লাস, দূরবীন এবং আগেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল যা প্রাথমিকভাবে ভারতীয়দের মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তাদের ভবিষ্য অভিপ্রায় ছিল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে ভারত থেকে ধীরে ধীরে প্রাকিতিক সম্পদ অন্বেষণ ও লুট করা। ব্রিটিশরা জরিপ ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সংস্থাপিত করে এবং আমাদের সম্পদ নিষ্কাশনের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। যেহেতু তারা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য গুরুতরভাবে একটি সহায়ক এবং সস্তা জনবলের প্রয়োজন আশা করেছিল তাই তারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভূগোল ও বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বোত্তম জ্ঞানসম্পন্ন স্থানীয় মানুষ নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের অপ্রধান পদমর্যাদা দিয়েছিলো। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজের নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ছিল আরও দক্ষ কর্মবাহিনী প্রস্তুত করা। এর থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ বিজ্ঞানীদের উপলব্ধি হয়েছিল যে তারা কখনো ব্রিটিশদের মত তাদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর লাভ করতে পারবেনা। তাছাড়া এই নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন যে, 'ভারতীয়রা বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে পারে না এবং তাদের যৌক্তিক চিন্তা নেই' - সেই শ্রুতিকথার শিকল ভেঙে সেই দিনগুলিতে তারা ফলপ্রদ মূল গবেষণা করেন। তারা ঔপনিবেশিকদের এই মানসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের সীমিত সম্পদ সহ পরোপকারীদের সমর্থনে উচ্চাভিলাষী গবেষণা শুরু করে।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম : কিভাবে কলকাতার একজন সুপরিচিত এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হযে ওঠে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৬৩ সালে যখন তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তার পেশাদার ডিগ্রী এম.ডি পেয়েছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি একজন সফল চিকিৎসক হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশন এর বাংলা শাখার সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৮৬৭ সালের মধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাশ্চাত্যের ওষুধের সাথে এলোপ্যাথি চিকিৎসা সাধারণ ভারতীয়দের জন্য ব্যয়বহুল ছিল। বিকল্পের সন্ধানে তার যোগাযোগ হয় সুপরিচিত হোমেওপ্যাথি প্র্যাকটিশনার ডঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে এবং তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তার পেশায় নিখুঁত এবং যথাযথ ছিলেন; তিনি সমস্ত বৈজ্ঞানিক নীতি ব্যবহার করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অধ্যয়ন এবং অনুশীলন শুরু করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগীদের চিকিৎসা করতে শুরু করেন। এটি ব্রিটিশরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। ব্রিটিশদের কাছে হোমিওপ্যাথির সমর্থন ছিল জার্মানির সমর্থনের সমান কারণ এটি জার্মানী থেকে উদ্ভূত যা তাদের কাছে অগ্রহনযোগ্য ছিল না। তাই ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ব্রিটিশদের শত্রু হয়ে ওঠেন এবং তারা প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্রিটিশ মেডিকাল অ্যাসোশিয়েশনের সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জার্নালে তার গবেষণা প্রতাখ্যান শুরু হয় ও অনুশীলন সীমাবদ্ধ করে দেয়। ভারতীয়দের উপর এই ধরনের নির্লজ্জ, বেআইনি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের দমন করে রাখতে পারেনি। এটা থেকে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উৎসাহ জন্মেছিল যা বিজ্ঞানের প্রকৃত চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ ভারতীয় সমাজসেবী, জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য সমর্থকদের সাহায্যে ডঃ সরকার ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৮৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং রাজকীয়ভাবে কলকাতায় ৬১,০০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ছিল জাতীয় উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে তার বিজ্ঞান এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৫ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) -এর পক্ষে তার প্রচারণার সময় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারব লেন,"সমিতির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় গবেষকদের বিজ্ঞানের সকল বিভাগে মূল গবেষণা দ্বারা অগ্রগতি এবং বিভিন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনকে সাবলীল করা"।

IACS কাজের ক্ষেত্রে সাতটি ফ্রন্টলাইন দিয়ে শুরু হয়েছিল যেমন পদার্থবিদ্যা ,রসায়ন ,জ্যোতির্বিদ্যা ,পদ্ধতিগত উদ্ভিদবিদ্যা ,পদ্ধতিগত প্রাণিবিদ্যা, ফিজিওলজি এবং ভূতত্ত্ব। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রফেসর ল্যাফন্ট, তারাপ্রসন্ন রায়, নীলরতন সরকার, চুনিলাল বস, জে.সি. বোস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথ নাথ বোস এমন কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবি ছিলেন যারা IACS এ শিক্ষাদান করতেন। IACS এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বিজ্ঞানের চর্চায় জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্নয়ন। এটি সকলেরই জানা ছিল যে,বিজ্ঞানে প্রথম এশীয় এবং ভারতীয় হিসাবে 1930 সালে স্যার সি.ভি.রমন তার "রমন এফেক্ট" এর জন্য নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন যার কৃতিত্ব দেওয়া হয় IACS কে যেখানে রমন তার গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন।

IACS-এর প্রভাব: IACS-এর ভূমিকা বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উত্থান হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে একজন ভূতত্ত্ববিদ প্রমথ নাথ বসু ১৮৯১ সালে ইন্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোশিয়েশন (Indian Industrial Association) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সদস্যরা দেশীয় কাঁচামাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে প্রমথ নাথ বসু, স্যার জামশেদজি নাসেরওয়াঞ্জি টাটাকে ছোটনাগপুর মালভূমির লোহার ভান্ডারের বিষয়ে জানা এবং জামশেদপুরে টাটা স্টীল মিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৪ সালে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education (AASIE) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এটা লক্ষ্যনীয় যে, বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজবাজার বিজ্ঞান কলেজ, বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট (১৯০৬) এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন –এর ফল। লক্ষণীয় বিষয় হল, এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক পরিধির বাইরে ছিল এবং শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজসেবী স্যার তারকানাথ পালিত, রাজনীতিবিদ ও সামাজিক কর্মী স্যার রাসবিহারী ঘোষ এর মত ভারতীয়দের আর্থিক অনুদানের উপর বেঁচে ছিল। ঔপনিবেশিকদের বৈষম্যমূলক আচরণ সত্বেও এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতায় উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করার কাজে নিযুক্ত থাকে। ১৯০৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত Calcutta Mathematical Society এক অনুরূপ প্রচেষ্টা যেখানে ভারতীয় ছাত্রদের গণিতের ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি এবং তাদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা ছিল এর লক্ষ্য। Calcutta Mathematical Society, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, সেই সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর সি.ই. কুলিস, প্রফেসর গৌরী শংকর দে এবং সহ সভাপতি প্রোফেসর ফণিন্দ্র লাল গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে তার নিদর্শন রাখতে পেরেছে।

এই তালিকায় আরও একটি সংযোজন হল স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসের গল্প। বোস একজন অসাধারণ পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ এবং জীবন বিজ্ঞানী, সেই সময়ে বিশ্ব জুড়ে তার ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক বিকিরণের বেতার বিচ্ছুরণ প্রদর্শন করে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা সত্বেও তাকে তীব্র জাতিগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। তিনি একজন অধ্যাপকের পূর্ণ বেতনের এক তৃতীয়াংশ বেতন সহ অস্থায়ী শিক্ষা পরিষেবা নিযুক্ত হন যা শুধুমাত্র ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত অধ্যাপদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এমনকি কেমব্রীজে তার অফিসিয়াল ডেপুটসনের সময় কর্তৃপক্ষ তার বেতন সহ ছুটি মঞ্জুর করেনি এমনকি তাকে নিজের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা নিজেকেই নিতে বাধ্য করা হয়। বসু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা "বসুধৈব কুটুম্বকম" -এ বিশ্বাসী ছিলেন তাই মানবতার স্বার্থে তিনি তার গবেষণার পেটেন্ট করেননি। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব এবং সংবেদনশীলতা তিনি তার পরীক্ষা এবং যন্ত্রের উদ্ভাবনী কৌশল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি তার সমস্ত সঞ্চয় ব্যবহার করে ১৯১৭ সালে বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (Bose Research Institute) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রধান আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের স্বার্থে এবং জাতীয় মর্যাদার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

তিনি উল্লেখ করেন, "আমি এই ইন্সটিটিউট কে উৎসর্গ করছি – শুধু একটি পরীক্ষাগার হিসেবে নয় বরং একটি মন্দির হিসেবে ..."। পরে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম বসু বিজ্ঞান মন্দির হয়।

আরেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যার নাম প্রোফেসর শংকর পুরুষোত্তম আঘারকার, তিনি পুনেতে একটি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। তিনি একজন ভারতীয় রূপতত্ত্ববিদ (Morphologist) ছিলেন এবং পশ্চিমঘাটের জীববৈচিত্রের একজন বিশেষজ্ঞ যেখানে তিনি আবিষ্কার করেন মিষ্টি জলের জেলিফিস, যা সাধারণত আফ্রিকায় পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বছরের জন্য তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশনের সচিবও ছিলেন। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত IACS দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অনেক শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে ১৯৪৬ সালে পুনেতে মহারাষ্ট্র অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (Maharashtra Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠা করেন। আঘারকার সর্বসম্মতিক্রমে ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। শুরুতে সেখানে ইন্সটিটিউট চালানোর জন্য কোনও তহবিল পাওয়া জানি। তাই অনেক বিজ্ঞানী স্বেচ্ছায় কোনও বেতন ছাড়াই কাজ করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে স্থাপন করতে তার স্ত্রীর গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'আঘারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউট' হিসেবে।

এটা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের জাগরণ – একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের উপাদান। ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থন ছাড়া এবং বিরোধীতা না করে দীর্ঘস্থায়ী দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি ও লালন-পালন করা একটি সাহসী সাহসী প্রচেষ্টা ছিল।

১৮৯৩ সালে জাপান থেকে শিকাগো সমুদ্রযাত্রার সময় একটি দেশীয় বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ভারতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্যার জামসেঠজি টাটাকে স্বামী বিবেকানন্দর পরামর্শ একটি সুপরিচিত উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দের পরামর্শ বাস্তবে পরিণত হয়েছিল যখন ১৯০৮ সালে জামসেটজি টাটার উদ্যোগে এবং মহীসুরের মহারাজার সর্বান্তকরণে সমর্থনের মধ্যে বেঙ্গালুরুতে ৩৫০ একর জমির উপরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপসংহারে, আমরা অনুমান করতে পারি যে ব্রিটিশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে লুট করা এবং নিম্ন আয়ের শ্রমিক উৎপন্ন করে তাদের আয় বৃদ্ধি করা। সুতরাং, স্থানীয় ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানুষের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ও জাতীয়তবাদী বিকাশ ঘটানো।

ভারতে জাতীয় বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম

Sonam Singh Subhedar

ভারতীয়দের কাছে হেনরি বেনেডিক্ট মেডলিকট একটি সাধারণ নাম নয়। হেনরি বেনেডিক্ট মেডলিকট ১৮৭৬-৮৭ সাল পর্যন্ত জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ছিলেন। তার ধারনা ছিল ভারতীয়রা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কোনও প্রকৃত গবেষণা করতে অক্ষম। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান ও গবেষণার অগ্রগতিকে বাধা দেয়। যারা বৈজ্ঞানিক গবেষনার অগ্রগতিতে প্রচেষ্ট তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণার পথ সরাসরি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রনে ছিল এবং ভারতীয়দের জন্য অবারিত ছিল না।

Madras Science Club was started in 1935 with the initiative of KS Varadachar

জাতীয় বিজ্ঞানের কাহিনী : পি.সি. রায়, জে.সি. বোস, সি.ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, আশুতোষ মুখোপাধায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, এম বিশ্বেশ্বর রায় প্রভৃতি বিজ্ঞানী এবং অন্য অনেক জাতীয়তবাদী মানুষ যারা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি , তারা ভারতীয়দের জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরিচয় ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জে.সি. বোস একবার তা উল্লেখ করেছিলেন "কোনও জাতির জীবনের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হল এর বুদ্ধিবৃত্তিক বিশিষ্টতা এবং জ্ঞানের সীমানায় অগ্রসর হয়ে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করা" তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বিজ্ঞান প্রবর্তন করা নয়, বরং ভারতীয় বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করা। পি.সি. রায়ের মতো আরও অনেক মানুষ ছিলেন যারা বলেছেন যে 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পারেনা।

এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে কাজ করার জন্য বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করা। এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল বিজ্ঞানের উপর জাতীয় মতামত প্রকাশ বা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রযুক্তি এবং গঠন প্রচারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি এবং গবেষণার অগ্রগতির জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং স্বাধীন জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিকী সম্প্রদায় গঠন করা। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য ল্যান্ডমার্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৮২৮ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ইউরোপীয়রা এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। ১৮২৯ সালে, প্রবণতা পরিবর্তিত হয় এবং বেশ কিছু ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজ বুনওয়ারী গোবিন্দ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজচন্দ্র দাস, রাম কমল সেন ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। ১২ই ডিসেম্বর ১৮৩২ সালে রাম কমল সেন স্থানীয় সচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে ১৮৮৫ সালে রাজেন্দ্রলাল রায় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে শুধু ১৮টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা ১০২১টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যখন তাদের নিজস্ব সমিতি গঠন করেন তখন ১৯২০ সালের মধ্যে ৩০৪১০২১টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

দেশীয় বিজ্ঞানে শক্তির আধান : ১৮৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী Indian Association of Cultivation of Science (IACS) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতের আবার জাতীয় বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে যে মানুষটি ছিলেন তিনি ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল জাতীয় উদ্দেশের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চা এবং ১৮৭৫ সালের প্রথম দিকে সরকার থেকে স্বায়ত্বশাসন স্থাপন করা। ডঃ সরকার বলেছেন : "আমাদের চেষ্টা করা উচিত সরকারের সাহায্য ছাড়া নিজেদের প্রচেষ্টায় কাজ চালিয়ে যাওয়া। আমি চাই এটি জাতীয় এবং সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় হবে"।

IACS –এর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ১৮৭৬-১৯০১ সময়কালে বিজ্ঞানচর্চায় জাতীয়তাবাদের ধারণা। শীঘ্রই, IACS -এর সদস্য প্রমথ নাথ বসু, ১৮৯১ সালে ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোশিয়েশন (IIA) প্রতিষ্ঠা করেন। IIA কয়লা এবং ফাইবারের উপর জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করে এবং সদস্যরা দেশীয় কাঁচামাল নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে পি.কে. রায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত এবং রসায়নে বিজ্ঞানের পৃথক কোর্স দাবি করেন। সালে নীলরতন সরকার, জে.সি. বোস এবং ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৮৯০ সালে কলকাতা Science Degree Commission গঠন করা হয়।

১৯০৪সালে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ Scientific and Industrial Education (AASIE) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী আন্দোলনে এই সমিতি বিদেশে ভারতীয় ছাত্র পাঠানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার এক প্রধান শিক্ষাবিদ সতীশ চন্দ্র মুখার্জী সমাজে জাতীয় শিক্ষার ধরণ প্রচার করার জন্য ১৯০২ সালে Dawn Society চালু করেন। Dawn Society –র পত্রিকা The Dawn

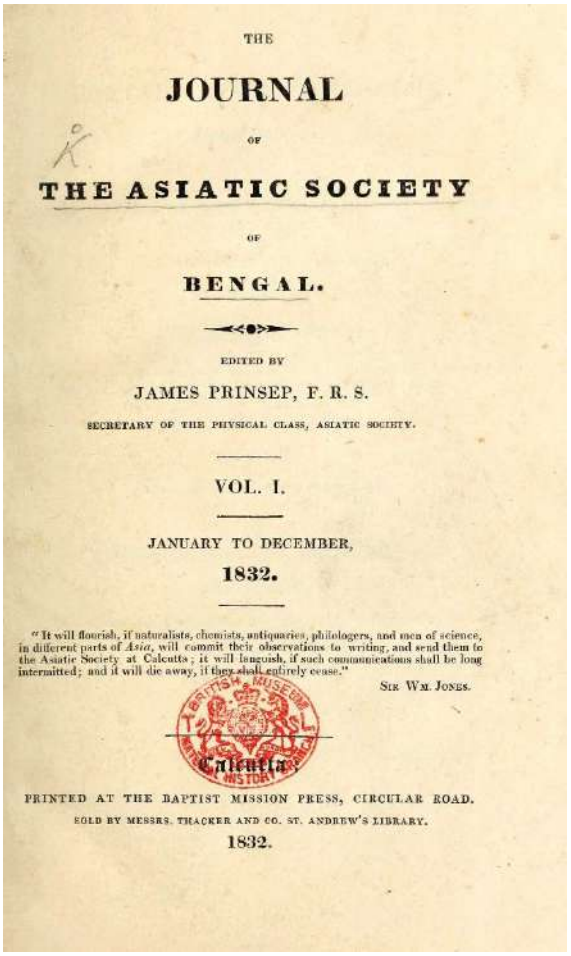

THE

JOURNAL

OF

THE ASIATIC SOCIETY

OF

BENGAL.

EDITED BY

JAMES PRINSEP, F. R. S.

SECRETARY OF THE PHYSICAL CLASS, ASIATIC SOCIETY.

VOL. I.

JANUARY TO DECEMBER,

1832.

"It will flourish, if naturalists, chemists, antiquaries, philologers, and men of science, in different parts of *Asia*, will commit their observations to writing, and send them to the Asiatic Society at Calcutta; it will languish, if such communications shall be long intermitted; and it will die away, if they shall entirely cease."

SIR WM. JONES.

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD.

SOLD BY MESSRS. THACKER AND CO. ST. ANDREW'S LIBRARY.

1832.

The Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1832

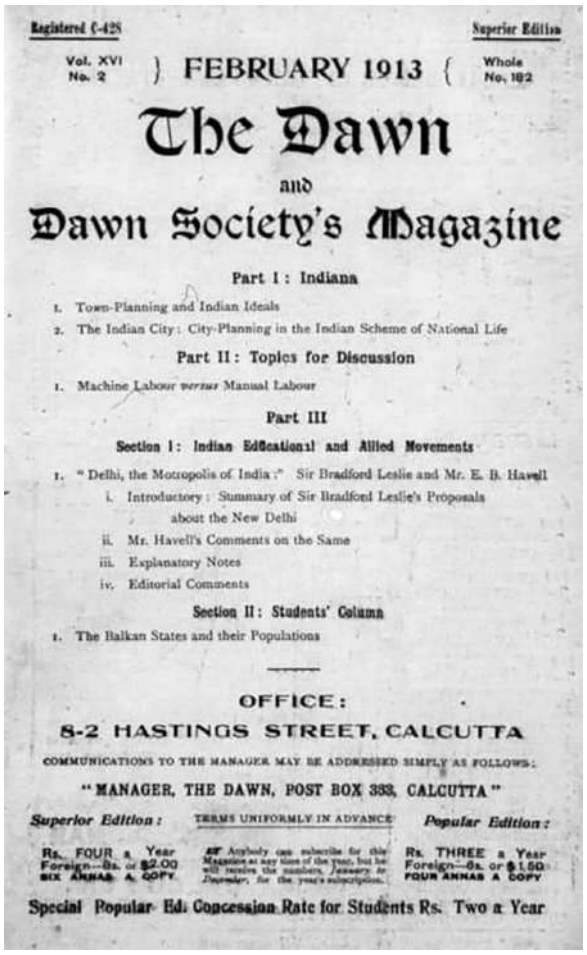

Registered C-428 — Superior Edition

Vol. XVI No. 2 } FEBRUARY 1913 { Whole No. 182

The Dawn

and

Dawn Society's Magazine

Part I: Indiana

1. Town-Planning and Indian Ideals
2. The Indian City: City-Planning in the Indian Scheme of National Life

Part II: Topics for Discussion

1. Machine Labour *versus* Manual Labour

Part III

Section I: Indian Educational and Allied Movements

1. "Delhi, the Metropolis of India:" Sir Bradford Leslie and Mr. E. B. Havell
   - i. Introductory: Summary of Sir Bradford Leslie's Proposals about the New Delhi
   - ii. Mr. Havell's Comments on the Same
   - iii. Explanatory Notes
   - iv. Editorial Comments

Section II: Students' Column

1. The Balkan States and their Populations

OFFICE:

8-2 HASTINGS STREET, CALCUTTA

COMMUNICATIONS TO THE MANAGER MAY BE ADDRESSED SIMPLY AS FOLLOWS:

"MANAGER, THE DAWN, POST BOX 333, CALCUTTA"

Superior Edition: TERMS UNIFORMLY IN ADVANCE *Popular Edition:*

Rs. FOUR a Year Foreign—Rs. or $2.00 SIX ANNAS A COPY

☞ Anybody can subscribe for this Magazine at any time of the year, but he will receive the numbers, January to December, for the year's subscription.

Rs. THREE a Year Foreign—Rs. or $1.50 FOUR ANNAS A COPY

Special Popular Ed. Concession Rate for Students Rs. Two a Year

The Dawn, the magazine of Dawn Society

সমাজে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে জাতীয় সীমা'-এই মন্ত্রে ১৯০৬ সালে Dawn Society, National Council of Education (NCE) হয়ে ওঠে। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিয়োগ ভারতীয়দের বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর গবেষণা এবং শিক্ষকতায় আর উন্নতি ঘটে। আন্দোলন ভালোভাবে শুরু হয়েছিল এবং কলকাতার বৈজ্ঞানিক বৃত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, দেশের অন্যান্য অংশেও এর প্রভাব ছিল। ১৯১৬ সালে রাজা গোপালচারী দ্বারা মাদ্রাজের সালেমে প্রতিষ্ঠিত হয় Tamil Scientific Terms Society। এই প্রতিষ্ঠানটি পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত এবং রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষায় নতুন তামিল শব্দ উদ্ভাবন করে। আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ –এর জন্য 'কর্নাটক ভিজনন প্রকারিণী সমিতি' গঠন করা হয়।

পিসি রায় এর অধীনে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিস্ট্রির ছাত্ররা রসায়নের বিকাশে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত হয় এবং এই ছাত্র প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের বিকাশে অবদান রাখে। ইন্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটির ভিত্তিতে পি.সি. রায়ের ছাত্রের অবদান রয়েছে। একইভাবে কলকাতায় স্কুল

অফ ফিজিক্স এর আবির্ভাব ঘটে। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সি.ভি. রমন, জে.সি. বোস ও এম.এন. সাহা এটি পরিচালনা করেন। স্যার ভেঙ্কটেশ রমন ছিলেন এর অধিনায়ক। পরে এটি 'রমন স্কুল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জার্নাল : ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রকাশনা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সমান্তরাল, যেখানে জাতি গঠনে বেশ কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক বিজ্ঞান নীতির একটি ধারার উদ্ভব হয়েছিল যা ভারতীয় বিজ্ঞানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থান দিয়েছে।

১৯৩১ সালে দিকে পাটনা সায়েন্স কলেজের ফিলোজফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ২৪শে এপ্রিল স্যার সি.ভি. রমন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত The Indian Academy of Sciences, Bangalore, একটি সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং একই বছরের ৩১শে জুলাই ৬৫জন প্রতিষ্ঠাতা সহকর্মীর সঙ্গে উদ্বোধন করা হয়। তাদের প্রথম সাধারণ সভায় সেদিন একাডেমির সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং রমন সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে মেঘনাদ সাহা ও পিসি রায়ের উদ্যোগে The Indian Science News Association প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাদ্রাজ সায়েন্স ক্লাব ১৯৩৫ সালে কে.এস. ভারদাচারের উদ্যোগে মাদ্রাজ সায়েন্স ক্লাব শুরু হয় এবং তিনি কারেন্ট সায়েন্স জার্নাল ফাউন্ডেশন -এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সমাজে বিজ্ঞানকে অগ্রসর করার জন্য নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা গবেষণা কার্যকলাপ একীকরণ করে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানযুগ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৮০৭-১৯৪৭ সময়ের জন্য ৬০০৮টিরও অধিক ভারতীয় সুপণ্ডিত প্রকাশনা ২৪৪টি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তার অন্তর্ভূক্ত তালিকাটি নিম্নলিখিত; ৪৮৯৯টি প্রবন্ধ, ৮৮০টি চিঠি, ১২৫টি নোট, ৪৩টি পর্যালোচনা, 7টি অধিবেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ৬টি ক্ষুদ্র জরিপ। ১৮০৭ সালে প্রথম প্রকাশনা থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত, ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ইতিহাস অনিয়মিত ছিল অর্ধ শতাব্দীতে প্রায় ৯৯টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৯ সাল থেকে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গেছে শুধুমাত্র সেই বছরেই ১২৩টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 1936 সালে ভারত থেকে সর্বোচ্চ প্রকাশনার সংখ্যা ছিল বছরে ৩৭৭টি নিবন্ধ। সম্ভবত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় একত্রীকরণের কারণে ১৯৩০ সালে প্রকাশনার বৃদ্ধি হয়। প্রকাশনার সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Section A (১৪৩২টি পত্র)-তে প্রকাশিত, এর পড়ে Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Section B (৬২১টি পত্র)-তে প্রকাশিত। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টি.আর. শেষাদ্রি রসায়নে ১৭৫টি নিবন্ধ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন.আর ধর ১৪৩টি নিবন্ধ এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স থেকে সি.ভি. রমন ৭৪টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কৃষি বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পরে রসায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গবেষণা ও কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষনার ফলাফল ভারতীয় জার্নালে প্রকাশ করতেই বেশি পছন্দ করতেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ভারতীয় প্রকাশনা The proceedings of the Indian Academy of Sciences জার্নাল ছিল বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি পছন্দের জার্নাল। জাতীয় বিজ্ঞান ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতার সাথে তাদের গবেষণা করতে সাহায্য করে। এই উদীয়মান জাতীয়তাবাদ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার সংগ্রামের সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করেছিল। এই সম্প্রদায় জাতীয় বিজ্ঞানের এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশংসা পেতে লড়াই করেছিল। এই দলটির প্রভাব ছিল সীমিত কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আন্তর্জাতিক স্তরে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনতে পারলে ভারতীয়দের স্বদেশ প্রেম বাড়বে। ১৯৩০ সালে সি.ভি. রমনের নোবেল পুরস্কার জয়ের সাথে সহযোগী গবেষকরাও আরও দুটি রয়াল সোসাইটির ফেলোশিপ পান। জে.সি. বোস একবার বলেছিলেন যে, "বাহির থেকে আবেগ সংবেদনশীল শরীরে দুটি ভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। সুতরাং, প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রেরণা প্রভাবিত করে এবং পড়ে নিজেই যখন একঘেয়েমী দেখে তখন তার জাতীয় স্মৃতি জাগ্রত হয়"।

Indian Academy of Sciences, Bangalore

Philatelic Tribute to India's Patriot Scientists

India's scientist leaders continue to live on through their ideas and the institutions they built. Here's how the country's Department of Post has paid tribute to them over the years

Jagadish Chandra Bose: A physicist, botanist, inventor of crescograph, Father of Bengali science fiction. Born on November 30, 1858.
Stamp released: November 30, 1958
Denomination: 15nP

Prafulla Chandra Ray: The Father of Indian Chemistry and founder of Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works (presently BCPL). Born on August 2, 1861.
Stamp released: August 2, 1961
Denomination: 15nP

Meghnad Saha: An eminent Indian astrophysicist who developed the Saha ionization equation. Born on October 6, 1893.
Stamp released: December 23,1993
Denomination: 1 Rupee

Mahendralal Sircar: Second Indian to graduate from the Calcutta Medical College, founder of IACS. Born on November 2, 1833.
Stamp released: November 2, 2009.
Denomination: 5 Rupee

Ruchi Ram Sahni: An educationist, meteorologist, physicist, and the father of renowned paleobotanist Birbal Sahni. Born on April 5, 1863.
Stamp released: October 24, 2013
Denomination: 5 Rupee

Yellapragada Subbarow Discovered the function of adenosine triphosphate (ATP) for the treatment of cancer. Born on January 12, 1895.
Stamp released: Dec 19, 1995
Denomination: 1 Rupee

Satyendra Nath Bose: Mathematician and physicist known for the Bose–Einstein statistics and the theory of Bose–Einstein condensate. Born on January 1, 1894.
Stamp released: January 1, 1994
Denomination: 1 Rupee

Ashutosh Mukherjee: Educator, jurist, barrister, mathematician, and Vice Chancellor, Calcutta University. Born on June 29, 1864.
Stamp released: June 29, 1964
Denomination: 15nP

M Visvesvaraya: Civil engineer, 19th Diwan of Mysore (1912-19), received Bharat Ratna in 1955. Born on September 15, 1860.
Stamp released: September 16, 1960
Denomination: 15 nP

CV Raman: First Indian and Asian to win the Nobel prize; won in 1930 for Physics for the discovery of Raman Effect. Born on November 7, 1888.
First stamp released: November 21, 1971
Denomination: 20 Paise

Srinivasa Ramanujan: An Indian mathematician with almost no formal training in pure mathematics, made substantial contributions to mathematical analysis, and continued fractions, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable. Born on December 22, 1887.
First stamp released: December 22, 1962; **Denomination:** 15nP

বিজ্ঞানী যারা কূটনৈতিক দূত হিসেবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে

Dr. Chaitanya Giri

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের ঘটনাপঁজী আশ্চর্যজনক। এটি প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কূটনীতিক, দার্শনিক, দ্রষ্টা এবং কৌশলবিদ সকল সদস্যদের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই মুক্তির একক লক্ষ্য নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আবৃত করার জন্য প্রায় দুই শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রচেষ্টা একটি ম্যারাথন দৌড়ের মত।

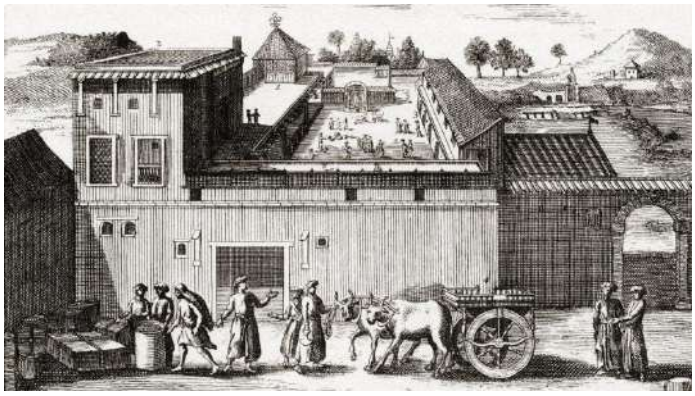

India in 1700s had the second highest contribution to the global GDP

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাঙ্গাস মাডিশনের ঐতিহাসিক ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক প্রবণতা অনুযায়ী ১৭০০-এর ভারতের অবদান ছিল বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) –এর প্রায় ২৩%, যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (চীনের পেছনে এবং ইউরোপের চেয়ে একটি ধাপ পরে)। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ, চীন ও ভারত সবই ছিল শিল্পায়িত। তবে ইউরোপের ঔপনিবেশিক উচ্চকাঙ্খা এবং নৌ সম্প্রসারণ শিল্পবিপ্লবের প্রথম চালক হয়ে ওঠে এবং পরবর্তি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও অর্থনীতি এর চারপাশে আবর্তিত হয়। ব্রিটিশরা পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) নিষ্পত্তির পর বাংলার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রেখে বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো বর্ধিত করে ভারতে তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যান্ডউইথ পেয়েছে। এটা ছিল সেই একই সময়কাল যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৭ সালে আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ সময়কাল, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণাটিক যুদ্ধ (১৭৪৬-১৭৬৩), অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-১৭৯৯) ও ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৭৭৫-১৮১৯) অংশগ্রহণ এবং ভারতের ভূখন্ডের বিস্তীর্ণ অংশের উপর বৃহৎ রাজনৈতিক দখলের সাক্ষী হয়। কোম্পানী সংযুক্ত অঞ্চল হিসাবে, রাজস্ব গ্রহণ, অবহাওয়া, কৃষি, টপোগ্রাফিকাল ও ত্রিকোণমিতিক সমীক্ষা শুরু করে। The Trigonometric Survey of India -এর মেগাপ্রজেক্টে BEIC –র সামরিক চাপ ছিল। তাদের সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে সাহায্য করার জন্য কলকাতা (১৭৮৬), মাদ্রাজ (১৭৯৬) এবং বোম্বের (১৮২৬) বন্দর শহরে BEIC পর্যবেক্ষক স্থাপন করেছে। ১৮৫০ এর পরে এই সমীক্ষার ফলস্বরূপ BEIC –এর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেল, রেডিয়ো, টেলিগ্রাফ, সরকারি নির্মাণকার্য, সেচ এবং খনির বিভাগ সংস্থাপিত হয়। সেই সময় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পেরেছিল যে , দ্রুত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল বিশ্বের উচ্চ অবস্থানে ব্রিটেনকে বসানোর হাতিয়ার। ব্রিটিশদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি শুষে নিতে এবং এটি দেশে আনার জন্য তাদের মধ্যে কিছু জনকে ১৮৫১ সালের ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রদর্শনীতে গবেষণা ফেলোশিপ হিসাবে আর্থিক অনুদান প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এটা নিশ্চিত করে যে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গবেষনার হাজার হাজার পাউন্ড ভারত থেকে অব্যবহারিত রয়ে গেছে।

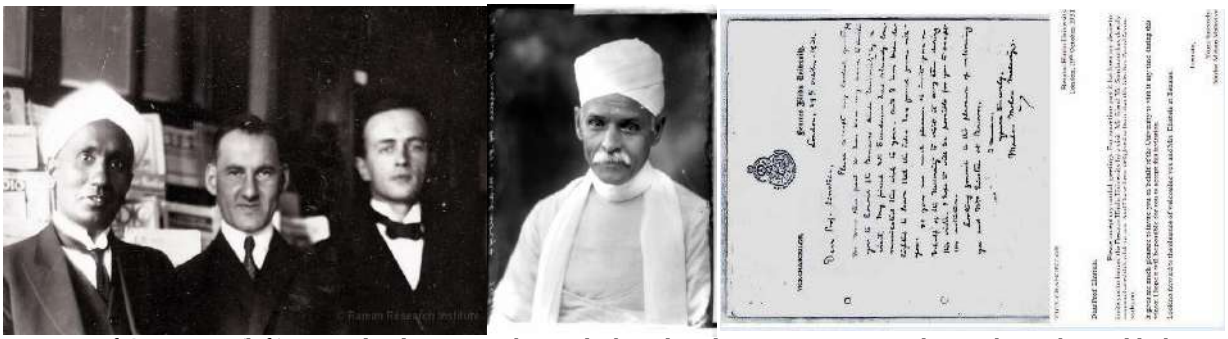

The success of CV Raman (left) inspired Indians to work outside the colonial support system. Wishing to bring the world's best to India, Madan Mohan Malaviya (centre) wrote to Albert Einstein, inviting him to BHU (right)

ব্রিটিশ সম্রাজ্যের ভারতীয় দপ্তর যা ১৮৫৭ সালের পরে আসে ও বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর এবং এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষনার কেন্দ্র ছিল কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষের শাসনকার্যে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ করার কাজে ব্যবহারিত হয়েছে।

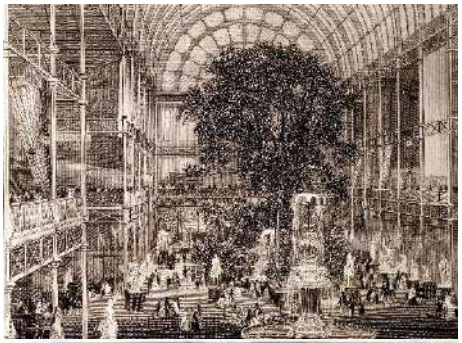

নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগতভাবে সফল ,সমৃদ্ধ ও বিবেকবান ব্যাংকার, আইনজীবী এবং মেডিকাল ডাক্তারদের প্রভৃতি মানুষেরা স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে যারা বিশ্বের কাছে ইউরোপীয়দের সমান পারদর্শী ছিল। অনানুষ্ঠানিক হলেও এই সম্প্রদায়ের মানুষেরাই ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তার আধার হয়ে উঠেছিল। তারা দ্রুত বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশ কখনোই ভারতীয় দের অত্যাধুনিক গবেষণার অনুমতি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এই অনীহার কারণ ছিল তাদের উদ্ভাবন শ্বাসরোধের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ভারতীয় অফিস কখনো কোনও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বৈজ্ঞানিক তহবিল উত্থাপনের চেষ্টা করেনি। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিজীবি যেমন, তারকনাথ পালিত, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহারাজ কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার, মহারাজ প্রভু নারায়ণ সিংহ, আনন্দ মোহন বসু, রয়াল সিংহ মাজিথিয়া, বিষ্ণু শাস্ত্রীয় চিপ্লংকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ সায়াজিরাও গায়কয়ার তৃতীয়, মহামনা মদন মোহন মালব্য, অ্যানি বেসান্ত, স্বামী বিবেকানন্দ এবং জমশেদজি টাটা ভারতের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্মাতা হিসেবে পথপ্রদর্শক ছিলেন হয়েছিলেন। তারা তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার জন্য অর্থনৈতিকও সাহায্য এবং বিদেশে তাদের ফ্যাকাল্টি প্রদান করার দায়িত্বভর গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত The Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) প্রথম ভারতীয় আধুনিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা ভারতের উদ্দেশ্যপূরণ করেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও সি ভি রমন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই তিন বিজ্ঞানী এবং তাদের ছাত্র র বিদেশে ঘন ঘন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান এবং ডক্টরল এবং পোষ্টডক্টরাল গবেষণা যোগদান শুরু করেন। বুদ্ধিজীবীর এখন তাদের সঙ্গী বিজ্ঞানীদের অগ্রণী কর্মজীবন দ্বারা ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক ত্রুটি দ্রুতি চিহ্নিত করতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারে ইউরোপীয় মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারে কিন্তু ইন্ডিয়া অফিস সেই সুবিধা দেবেনা। এই লক্ষ্যে তারা শুরু করে ট্র্যাক-2, নন কমনওয়েলথ দেশ বিশেষ করে যারা তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্র এবং মার্কিন

J.C.Bose demonstrating his work at the Davy-Faraday laboratory of the Royal Institution, London

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে তাদের সঙ্গে সরাসরি কুটনীতি শুরু । তাদের প্রথম আলাপ ছিল আসলে ম্যানহাটান প্রজেক্টে কাজ করা একজন ভারতীয় ও একজন করে। এই কূটনৈতিক যোগাযোগ সাফল্যতা পায় ১৯২৯ সালের roaring twenties এর সময়কালে, যা ১৯২৯ সালের Great Depression সেট করা হয়েছিলো l Roaring Twenties এর সময়কালে টরেন্টোতে সিভি রমনের সাথে আর্থার কম্পটন –এর সাক্ষাৎ হয়আমেরিকান বিজ্ঞানীর পূর্বনির্দিষ্টি সাক্ষাৎ। দেবেন্দ্র মোহন বস, যে সি বসের ছাত্ররা বার্লিনে পদার্থবিদ এরিখ রেজেনারের সাথে পোস্ট ডক্টরল গবেষণা গ্রহন করছিলেন। শংকর আগরকার, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নির্দেশে বার্লিনে বিক্ষত উদ্ভিদবিদ অ্যাডলফ ইঙ্গলারের এর তত্বাবধানে ডক্টরেট গবেষণা শুরু করেন। এস এন বোস, জে সি বোসের অন্য ছাত্ররা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ লুই ডি ব্রগলি এবং নোবেল জয়ী মারি কুরির সঙ্গে তার পোস্ট ডক্টরল গবেষনার জন্য প্যারিস যান। সি ভি রমনের ছাত্র সুশীর কুমার মিত্র বিখ্যাত স্পেকট্রোস্কোপিষ্ট চার্লস ফেব্রির অধীনে প্যারিস থেকে ডক্টরেট প্রাপ্ত করেন। তার পোস্ট ডক্টরাল গবেষনার জন্য তিনি মেরি কুড়ি এবং রাডার ফিজিসিস্ট ক্যামিল বাটন এর সাথে কাজ করেন।

রমনের নোবেল পুরস্কার পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক বৃত্তে ভারতের পথ খুলে দেয়। বিশ্বের সেরা কিছু বিজ্ঞানীদের অধীনে প্রশিক্ষণ অনেক উপায়ে ভারতের বিজ্ঞান কুটনীতিতেও সাহায্য করেছে।এস কে মৈত্রের ফ্রান্সে তার দীর্ঘ মেয়াদ তাকে প্রথম এবং সম্ভবত শুধুমাত্র ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে ১৯৩২-৩৩ সালের আন্তর্জাতিক পোলার ইয়ার সম্মেলনে উপস্থিত হতে দেয়। তার এই নির্জন পথচলা স্বাধীনতার পরবর্তি সময়ে ভারতকে ১৯৫৭-৫৮ সালের আন্তর্জাতিক জিওফিজিক্যাল বছরে একটি বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দল পাঠাতে সাহায্য করে। আমাদের বিজ্ঞানীরা সহ যারা ব্রিটেনে গবেষণা করে তারা সারা বিশ্বের পন্ডিতদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে যার ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তি বিজ্ঞান কূটনীতি শিখরে পৌছায়।

এই কৃতিত্ব অর্জন একটি গুনক ছিল যা ঔপনিবেশিক বিপর্যয় মুছে ভারতীয়দের সঠিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে সাহায্য করে। এই সাফল্যগুলি ভারতীয়দের পরবর্তি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এর ফলে কূটনৈতিক প্রটোকল অনুসরণ করে অনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব-খ্যাত বিজ্ঞানীদের নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে মহামনা মদন মোহন মালভিয়ার আমন্ত্রন। ১৯৩৫-৩৬ সালে মহামনা মালভিয়া, আইনস্টাইনকে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য আমন্ত্রন জানান। আইনস্টাইন অনুকূল ভাবে আমন্ত্রণে সাড়া দেন কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। যদি আইনস্টাইন এই সুযোগ মেনে নিতেন, তবে তিনি ম্যানহাটন প্রকল্পে আহবান এর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজবেলটের কাছে তিনি চিঠি লিখতেন না। ম্যানহাটন প্রজেক্ট না হলে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপন হতো না। তিনি যদি ভারতে আসতেন, তবে ইসরায়েলি জাতি গঠনের অন্যতম বিজয়ী ভারতের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতো। ইহুদি এবং জার্মানদের মতো যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হয়েছিল ও পরবর্তি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সাহায্য করেহকে তারা ভারতে আসতেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে মহামনের আইনস্টাইনকে আমন্ত্রন জানানোর সিদ্ধান্ত সর্বদাই এক বিস্ময়কর কূটনৈতিক কাজ বলে স্বীকৃতি পায়। ১৯৩০ –এর দশকের মাঝামাঝি, ভারত থেকে আসা পন্ডিতদের এই বিশাল ঢেউ এমনকি ব্রিটেনও প্রতিহত করতে পারেননি। এই সময় Maharashtra Association for Cultivation of Sciences-এর প্রতিষ্ঠাতা শংকর আগারকার 1851 সালে বিজ্ঞানে ভারতীয়দের গবেষণা ফেলোশিপে অনুদান অবরোধ মুক্ত করেছেন এবং হোমি জেহাঙ্গীর ভাবা –কে এর প্রথম প্রাপক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শত শত বুদ্ধিজীবি যারা আড়াই শতাব্দী থেকে বেশি সময় ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের সাথে লড়াই করেছে আজ ভারতের বিজ্ঞান তাদের কাঁধে দাড়িয়ে আছে। এই অজ্ঞাত মুক্তিযোদ্ধাদের অহিংস যুদ্ধের গল্প বারবার বলা প্রয়োজন, বিশেষ করে এখন যখন সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও রয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রান্তে।

So They Said...

Acharya PC Ray on Rowlatt Act, 1919, extracted from his book, *Life and Experiences of a Bengali Chemist*, Volume 1

A mass meeting was held at the Town Hall- the principal speaker being C. R. Das, who was just then coming to the fore. My friend Satyananda Bose called on me one afternoon and suggested to me that I might go a little earlier to my usual maidan constitutional walk so as to be present at the meeting. It was thus only by an accident that I happened to be one of the audience. The ground floor of the Town Hall where the meeting was held was packed to suffocation and a large crowd had also gathered on the southern flight of steps as also on the broad street. C. R. Das in order to be audible to the vast seething mass of humanity took his stand on the front of the steps. Naturally I was at the back of the audience and occupied a very inconspicuous place. Somehow or other I was recognised and pushed forward by those about me and placed alongside of Das. Everyone was anxious that I should have my say; what then happened is thus described by a local daily [The Amrita Bazar Patrika, Thursday, 6 February 1919, Page 3]:

"Mr. C. R. Das then asked Dr. Sir P. C. Ray to speak on the resolution. Dr. Ray rose to speak and then was witnessed a scene which I shall never forget. For a few minutes Dr. Ray could not utter a single syllable as ovation after ovation, -cheers after cheers, shouts of "Bande Mataram" greeted the venerable Doctor. Dr. Ray began by saying that he had not the remotest idea that he would have to address the meeting even for a single moment. He came as a mere spectator. He was a man of the laboratory but he felt that there are occasions – the rest of the sentence was drowned in deafening cheers. Dr. Ray repeated that he felt that there are occasions which demanded that he should leave his test-tube to attend to the call of the country. "So grave was the danger to our national life that even Dr. P. C. Ray left his work in the laboratory and joined the meeting to raise his voice of protest against the obnoxious Bill".

"We need a spirit of victory, a spirit that will carry us to our rightful place under the sun, a spirit which will recognise that we, as inheritors of a proud civilisation, are entitled to a rightful place on this planet."

Sir C V Raman

"It would be our worst enemy who would wish us to live only on the glories of the past and die off from the face of the earth in sheer passivity. By continuous achievement alone we can justify our great ancestry. We do not honour our ancestors by the false claim that they are omniscient and had nothing more to learn."

Jagadis Chandra Bose
in an address to BHU students

"We should endeavour to carry on the work with our own efforts, unaided by the government. I want it to be solely native and purely national."

Mahendralal Sircar
on the founding of the Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), 1876

ভারতের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের গল্প

Vivekananda Pai

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ৩৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ব্রিটিশ শাসনামলে একটি অন্ধকার অধ্যায়। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অনেক দুর্ভিক্ষ (১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ সালে, ১৮৮৯ এবং ১৮৯২ সালে, ১৮৯৭ সালের এবং ১৯০০ বা ১৯৪৩ সালে) ঘটে যা সবই ব্রিটিশদের দ্বারা 'সংগঠিত এবং বৈধ লুণ্ঠন'। এই বৃহৎ লুণ্ঠনের একটি হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞানের ব্যবহার এটিকে আরও অনেক বেশি প্রাণঘাতী করে তুলেছে। ১৭৬৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের এক দশকের মধ্যে রিসোর্স ম্যাপিং-এর জন্য ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা এবং অন্যান্য অনুরূপ সংস্থার প্রতিস্থাপন গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ছিল নিরাপদ সমুদ্র নেভিগেশন, বন্দরে সম্পদ পরিবহনের জন্য রেলপথ সমর্থন এবং এ সবই সকলের সম্পদ আহরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যাইহোক, অনেকক্ষেত্রে এটি দূষিতভাবে একটি জ্ঞানের অনুসন্ধান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' সেই কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদকে নিয়ে উপহাস করত, তথাপি এরা কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের বিরাজমান রেখেছিল। সেখানে উনিশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ দশকের প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের একটি নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করা হয়েছিল যা কাজ এখনো বৈজ্ঞানিক জগতে অনুরণিত। তারা ধনী ভারতীয়, ভারতীয় শাসক এবং বুদ্ধিজীবি অনেকের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। এর ফলস্বরূপ The Indian Association for the Cultivationof Science (IACS), Indian Institute of Science (IISC), Maharashtra Association for Cultivationof Sciences (MACS) এর মত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দ্বারা বেঙ্গল কেমিকলসের মত শিল্পও গঠন হয়। ১৭৫৭ সালের আগে বাংলার প্রদত্ত উদ্বৃত্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ছিল; আমদানির থেকে এর রপ্তানী চারগুণ ছাড়িয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ১৭৫৭-৮০ সময়কালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলাকে ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ইংল্যান্ডে পাঠাতে বাধ্য করা হয়। এই আর্থিক সম্পদ একদিকে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবে সাহায্য করেছে অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়িত করে ভারতে একটি শিল্প পণ্যের বাজার সুনিশ্চিত করেছে। এই প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের শিল্প একটি মারাত্মক যন্ত্রনা ভোগ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অর্থনীতি ছিল যার গ্লোবাল জিডিপি ৩০% এর বেশ ছিল। ১৭৫৭ সালে গ্লোবাল জিডিপিতে এর অবদান ছিল প্রায় ২০%। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছরে যখন ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যায় তখন এটি প্রায় ৪% কমে যায়।

অষ্টাদশ শতকের সময় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, ভারতীয় অর্থনীতির তিন স্তম্ভের সমস্ত ছিটকে পড়েছিল বৈষম্যমূলক শুল্ক, ভূমি কর এবং শিকারী নীতির মাধ্যমে। পন্ডিত মদন মোহন মালভিয়া ১৯১৬ সালের শিল্প কমিশনের প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে ধ্বংসের কারণ স্পষ্টভাবে নিয়ে আসেন। এই নোট ক্রস রেফারেন্সের সংখ্যা গভীর অধ্যয়নের পাশাপাশি সত্যতার নির্দেশক। তিনি বিশেষভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেন যেখানে আমরা বিধ্বস্ত হয়েছিলাম : ১. তুলা ও বস্ত্র শিল্প, ২. লোহা শিল্প, ৩. জাহাজ তৈরি এবং শিপিং শিল্প ।

রমেশ চন্দ্র দত্ত তার প্রামানিক কাজ Economic History of India Under Early British Rule –এ প্রকাশ করে, ব্রিটিশইস্ট ইন্ডিয়ার পদ্ধতি ভারতকে কিভাবে শেষ পর্যন্ত শিল্পহীনতার দিকে নিয়ে যায়। ১৭৬৯ সালের ১৭ই মার্চ বাংলা কে লেখা চিঠিতে কোম্পানী কাঁচা সিল্ক এর উৎপাদনে উৎসাহিত করে কিন্তু সিল্ক কাপড় উৎপাদন করতে নিরুৎসাহিত করে। সিল্ক উৎপাদনে যারা সুতা কলে কাজ করত তাদের কোম্পানীর কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং নিজেদের বাড়িতে কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়।

ঢাকে কা মলমল : ঢাকাই মসলিনের গল্প ব্রিটিশ কার্যপ্রণালীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। 'ঢাকে কা মলমল' শতাব্দী জুড়ে ধনীদের রুচি ধরে রেখেছিল এবং মহাদেশগুলিতেও এর শক্তিশালী প্রভাব ছিল। ১৪ শতকের সুফি কবি আমির খসরু, তার রচনায় এটিকে 'নীহায়াত-উল-কামাল' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঢাকাই মসলিনকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : এর বয়ন প্রণালী এত সূক্ষ্ম যে এর একশো গজ কাপড়ের

অংশ সুচের চোখের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং ইস্পাতের সুই সহজে এটি ভেদ করতে পারেনা। এটি এত স্বচ্ছ এবং হালকা যে মনে হয়, যেন কেউ কোনো পোশাকে নেই এবং শরীরে শুধু বিশুদ্ধ জলের প্রলেপ রয়েছে। ১৭ই শতকের দিকে সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন নেপোলিয়নের প্রথম স্ত্রী এবং রানী, মেরি অ্যান্টইনেটের পছন্দের এই পোশাক পশ্চিমেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সব পণ্য ব্রিটিশদের জন্য বাঁধার সৃষ্টি করে ফলে তারা এই শিল্প ধ্বংসের নীতি স্থির করে। উইলিয়াম বোল্টস ১৭৭২ সালে তার 'Considerations on India Affairs' বইটিতে তাঁতিদেরদুর্দশার কথা লিখেছেন – "যেসব তাঁতিরা তাদের পণ্য বিক্রি করার সাহস দেখাত, কোম্পানীর এজেন্ট দ্বারা তাদের নির্যাতন করা হতো এবং যথেষ্ট অর্থের অংক জরিমানা দিয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হতো। তাঁতিরা চুক্তি সম্পাদন করতে অক্ষম হলে কোম্পানীর এজেন্টরা তাদের থেকে মুচলেকা নিয়ে ঘাটতি পূরণ করার জন্য ঘটনাস্থলেই তাদের মালপত্র জব্দ ও বিক্রি করত। যারা কাঁচা রেশমের কাজ করত তাদের সাথেও এমন অবিচার করা হয়েছে, এমনকি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য তাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হতো।" লোহা শিল্পের ক্ষেত্রে, পন্ডিত মালবিয়া তার প্রতিবেদনে উদ্ধৃত করেছেন : "ইংল্যান্ডে কাটলারির জন্য ভারতের ইস্পাতের যথেষ্ট উৎপাদন একটি উচ্চ মানে পৌঁছেছে"(মহাদেবের গোবিন্দ রানাডের 'Essay on Indian Economics' থেকে নেওয়া)। ব্রিটিশরা এই সব শিল্প থেকে মানুষের জীবিকা নির্বাহ করা বঞ্চিত করে। ফলস্বরূপ, প্রায় ৮০% মানুষ শেষ পর্যন্ত কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়।

আত্মনির্ভরতার জন্য সংগ্রাম : অনেক ভারতীয় ব্রিটিশদের লীলা-খেলা পরোক্ষ করেছে। মানুষের মনন ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে ঝুকতে থাকে। এই কারণে জে এন টাটার মত শিল্পপতি, প্রমথনাথ বসু এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত sবিজ্ঞানীরা এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যেমন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই বিষয়ে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলো। জামশেদজি নুসেরওয়ানজি বলেছেন যে, ইস্পাত হল ভারী শিল্পের জননী, সস্তা জলবিদ্যুৎ এবং শিল্পের পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষা গবেষণা; শিল্পে স্বনির্ভরতার তিনটি স্তম্ভ। সেই অনুযায়ী, তিনি কেন্দ্রীয় প্রদেশে একটি স্টিল প্লান্ট স্থাপনের কাজ শুরু করেন। প্রায় একই সময়ে প্রমথ নাথ বসু ময়ূরভঞ্জের কিছু অংশে ভূগর্ভস্থ বিশাল লৌহ আকরিক স্তম্ভ আবিষ্কার করেন।

Jamsetji Nusserwanji Tata

১৯০৪ সালে ২৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি জেএন টাটা কে তার চিঠিতে লিখেছেন : "আপনি যেমন এই দেশের লৌহ শিল্পের উন্নয়নে আগ্রহী সুতরাং আমাকে আপনার নজরে আনতে হবে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ব্যাপক ভূগর্ভষ্ট লৌহ আকরিক স্তর যা আমি সবেমাত্র অন্বেষণ করেছি। আকরিকগুলি মাগনেটাইট, হেমটাইট এবং লিমোনাইট দ্বারা গঠিত এবং তারা অক্ষয় বলে মনে করা হয়..."। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের সাথে আরও আলোচনা এবং চর্চার পর খ্যাতিমান জে এন টাটা বিহারে সাকচিতে (বর্তমানে জামসেদপুর হিসেবে পরিচিত) 'Tata Iron and Steel Works' প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তি স্থাপনে পি এন বোস সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। পি এন বোসের জ্ঞানের মূলধন এবং টাটার আর্থিক বিনিয়োগ দ্বারা এটা সম্ভব হয়।

প্রমথনাথ বসু ছিলেন প্রথম ব্যাক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূতাত্বিকভাবে কাশ্মীর থেকে তুতিকোরিন এবং আরব সাগর থেকে বার্মা পর্যন্ত ভারতের মানচিত্র তৈরি করেন। তিনিই প্রথম আসামে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি একটি ব্রিটিশ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। তথাপি তিনি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, GSI সুপরিডেন্টের পোস্টে পদোন্নতির সময় তার ১০ব ছরের জুনিয়র, টমাস হল্যাণ্ড একজন ব্রিটিশ অফিসারের পক্ষে যায়। তিনি পদত্যাগ করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে ময়ূরভঞ্জের রাজ্য শাসক দ্বারা তাকে রাজ্য ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনিই ভারতের প্রথম ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেন।

১৯০৬ সালে বাংলা টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় তিনি অনুপ্রেরণার একটি প্রধান উৎস ছিলেন এবং পাশাপাশি তিনি এটির অনারারি প্রিন্সিপ্যাল ও রেক্টর হন। পি এন বোস 'History of Hindu Civilization' গ্রন্থটি চার খন্ডে রচনা করেন।

ভারতে রাসায়নিক শিল্পের পথপ্রদর্শক, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় : ১৮৯২ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলকাতায় ৯১, আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নেন ও বেঙ্গল কেমিকাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার তৎকালীন তুচ্ছ বেতন থেকে সঞ্চয় করা ৭০০ টাকা মূলধনের সাথে কাজ শুরু করেন। তার ৭০তম জন্মদিনে জগদীশ চন্দ্র বসু বলেছিলেন: '... তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শিল্পের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন'। তিনি অন্যান্য শিল্প যেমন বেঙ্গল মৃৎ-শিল্প, বেঙ্গল ক্যানিং অ্যান্ড কন্ডিমেন্ট, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্ক্স, বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, বেঙ্গল পেপার, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র কটন মিল, জাতীয় ট্যানারি এবং ভারতীয় স্কেলস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠান : ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত The Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) যেখানে সিভি রমনের গবেষণা এশিয়ার প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পায়। মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট মনোভাব রেখেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, বাঙ্গালোরে Indian Institute of Science প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেন। তার শিষ্য ভগিনী নিবেদিতা মহীসুরের মহারাজার কাছ থেকে জমি পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। লাল লাজপত রায় ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলেন। জাতীয় স্বনির্ভরতার জন্য বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গাথার মধ্যমে শিল্পোদ্যোগ এবং স্বতন্ত্রতার জন্য সংগ্রামে ভারতীয় ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুনঃসংযোগ স্থাপন

Prof. Jayanti Dutta

ঔপনিবেশিক যুগের বিজ্ঞানীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য, তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে এক গৌরবময় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আজ আমরা তাদের 'স্বায়ত্বশাসনের' দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তার বাস্তবসম্মত উপায়ে তাদের ধারণা এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ভারতকে গননা করার মত শক্তি তৈরি করে নিজেরদের পরিচিত করব।

Mahendralal Sircar, the founder of IACS

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যেসব কারণে স্বীকৃতি পায় :

1. ভারতীয় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা
2. ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
3. গুণমান বিজ্ঞান অনুশীলন
4. বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া
5. বিজ্ঞান শিক্ষাদান

ভারতীয় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা : জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় গড়ে তোলার স্বার্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। জগদীশ চন্দ্র বোস, মহেন্দ্রলাল সরকার এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর মত অগ্রণী ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান' সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ বিজ্ঞান সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় আদর্শ অনুসারে বিজ্ঞানকে পশ্চিম থেকে বিভিন্ন উপায়ে ভিন্ন করার উপর গভীর জোর দিয়েছে। এই বিজ্ঞানীরা তাদের নিজের জীবনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় সহযোগিতা ছাড়া বিশ্বের বিজ্ঞানের অগ্রগতি চিরকাল অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞানকে গ্রহণ, সংযোগ এবং শক্তিশালী করে তোলা।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতের প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান সমিতি The Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯১৭ সালে জগদীশ বসু, বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই উদ্যোগগুলিকোন সরকারী পৃষ্টপোষকতা ছাড়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগতভাবে অর্থায়ন ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিতের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপকের চেয়ার সহ পাবলিক ফান্ডের মাধ্যমে 'বিজ্ঞান কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

Ashutosh Mukherjee established the College of Science in Calcutta through public funds

মহেন্দ্রলাল সরকার 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' (১৮৬৮) প্রকাশনার উদ্যোগ নেন এবং ভারতীয় গবেষণাপত্রের প্রকাশনার জন্য দেশীয় একটি স্থান তৈরি করেন।

গুণমান বিজ্ঞান অনুশীলন : এই সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা, গুণগত মানের দিক থেকে এত উচ্চ ছিল যে পক্ষপাতদুষ্ট ঔপনিবেশিক ব্যক্তিত্বরাও তাদের অসাধারণ প্রতিভা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জগদীশ চন্দ্র বোস বলেছেন যে, ভারতীয়দের গবেষণা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে যাতে কেউ তাদের পরীক্ষামূলক ত্রুটি খুজে না পায়, কারণ এই ত্রুটি তাদের অযোগ্যতা হিসেবে দেখা হবে এবং উসকানি সহযোগে ভারতকে কলুষিত করা হবে।

বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জার্নালে প্রকাশ করেছেন এবং নোবেল পুরস্কার, রয়াল সোসাইটির ফেলোশিপ এবং আরো অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে। আমাদের গবেষণা প্রকাশনার পরিমাণ অনুযায়ী অনেক কিন্তু তারা কোনো চিহ্ন তৈরি করতে ব্যর্থ। ঔপনিবেশিক মানসিকতা এখনও আমাদের সাক্ষাৎকার, সমালোচক, সহকর্মী বা শিক্ষক হিসাবে তাদের অনমনীয় চেহারা দেখায় যারা অভিনব ভারতীয় দৃষ্টিকোণ বিকাশকারী গবেষকদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাস করে। বর্তমানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন, সম্ভাবনার উপর আস্থা রেখে দেশের স্বার্থে প্রাসঙ্গিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ।

বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া : যৌক্তিক চিন্তা, সুস্থ সন্দেহ, কৌতুহল, প্রশ্ন করার মানসিকতা, প্রত্যেক সমস্যা সমাধানের মনোভাব, সমাজকে কোনরকম বস্তুগত পরিশোধ ছাড়া সুবিধা প্রদান করতে পারে। বোধগম্য উপায়ে বিজ্ঞানকে উপস্থাপন করা বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য, এই রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য তারা জনসাধারণের পেশাদার হয়ে ওঠে। তারা সুশীল সমাজের শ্রোতাদের জন্য বক্তৃতা, প্রদর্শনী, আঞ্চলিক ভাষায় নিবন্ধ লিখেছেন এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, A History of Hindu Chemistry (১৯০২ ও ১৯০৮) গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ডের মাধ্যমে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু The Science Association of Bengal (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, মেঘনাদ সাহার জার্নাল Science and Culture (১৯৩৫) এবং রুচিরাম সাহনি তার সুপ্রসিদ্ধ জনসম্মুখ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের জনসাধারন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান দূর করার প্রচেষ্টা করেন। ভারতীয় জনসাধারনকে বিজ্ঞানমুখী করার এই স্বপ্ন এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে। ভারতীয়রা এখনো সম্পূর্ণভাবে কুসংস্কার মুক্ত নন, সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার অভাব, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতায় বৈজ্ঞানিক বিধিনিষেধের অসম্মতি এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অভাব ইত্যাদি দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। ভারতীয় শিক্ষাবিদদের এই সমস্ত বাধা দায়িত্ব সহকারে দূর করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদান : শিক্ষকতাও ছিল জাতীয়তাবাদী সম্পাদ্য কার্যবলী। এর মধ্যে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই ছিলেন আন্তর্জাতিক নায়ক যারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষকতাও করেছেন। এই অগ্রদূতরা সমগ্র প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছাত্রদের যারা নাম করা বিজ্ঞানী হতে চেয়েছে তারাই শ্রেষ্ঠত্বর ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলির দ্বারা দেশের মানুষ যেভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার পেছনে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির অজস্র গুণী-জ্ঞানী শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরো বেশি শক্তিদান করা। শুধুমাত্র নাক্ষত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নয়, গ্রামীণ, উপজাতীয় স্কুল ও কলেজ সর্বত্র বিজ্ঞান শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শত বছর আগে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে পথের স্বপ্ন দেখেছিল তা আজ আশ্চর্যজনকভাবে খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের নিজেদেরকে যোগ্য উত্তরসূরী প্রমাণ করতে হবে।

পাশ্চাত্য চিন্তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী

Dr. Mrittunjoy Guha Majumdar

এখানে একজন মানুষের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুন্দর স্তবক তিনি উচ্চপদে ধরেছিলেন – স্যার জগদীস চন্দ্র বসু। লর্ড কেলভিন একবার জগদীস চন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন যে, "আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন বিস্ময় এবং প্রশংসায় ভরা, এত কঠিন সাফল্যের জন্য এবং অভিনব পরীক্ষামূলক সমস্যা যা আপনি অভিক্রমন করেছেন তার জন্য আমি আপনাকে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করতে বলব। তার কাজ এত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে এটি আক্ষরিক অর্থে এবং সম্প্রতি একটি প্রভাব ফেলেছে, তাই তার নামানুসারে চাঁদের একটি গর্তের নাম করা যায়।

তিনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে সংবেদনশীল ঐক্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা কিন্তু আমরা প্রায়ই উপলব্ধি করিনা। সংবেদীতা শুধু সচেতনতা এবং পর্যবেক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণে নয় বরং একটি বস্তুর মধ্যে অনুভূতির প্রাথমিক রূপ উদ্ভিদ থেকে ধাতু পর্যন্ত। এর জন্য তিনি দুটি ভিন্ন ধরার চিন্তাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন: বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিকতা যা সমস্ত সত্ত্বার মধ্যে বাস্তবতার ঐক্য সমর্থন করেছে, যেখানে ঐক্যকে মৌলিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'অস্তিত্ব, চেতনা এবং সম্পূর্ণতা'।

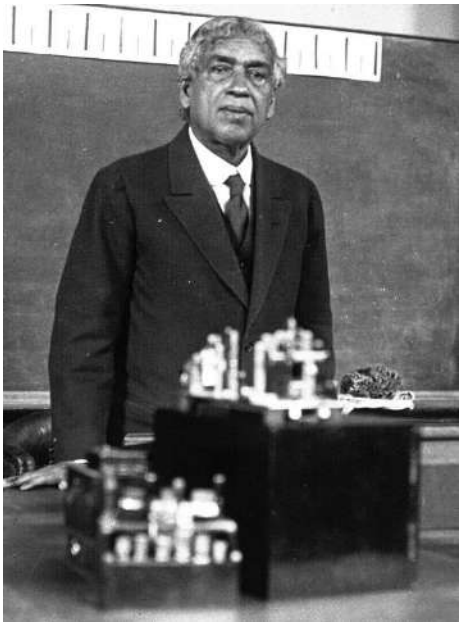

Sir Jagadish Chandra Bose during a lecture in 1928

জগদীস বসুর আকর্ষনীয় যাত্রা একটি শিশুর কৌতুহল দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিভাবে প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব কাজ করেছে এর গোপন রহস্য জানার চেষ্টা করতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে বিক্রমপুরে সম্মেলনে বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ প্রাণীদের কথা বোস মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছেন। সম্ভবত এই গল্পগুলো তার মধ্যে প্রকৃতির কাজগুলোর তদন্তে একটি গভীর আগ্রহ মনে তৈরি করেছে। কেমব্রিজে ক্যাভেংন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণের সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানে বোসের যাত্রা একটি বিশাল যায়গায় পৌঁছায়। তার quasi-optic millimeter wave গবেষণায় অগ্রগামী কাজের জন্য Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) জগদীশ বসুকে 'বেতার বিজ্ঞানের জনক' হিসেবে অভিহিত করেছে। বোস অনেক বৈষম্যের সম্মুখিন হন, জার্নালে তার গবেষণা প্রকাশনা অবরুদ্ধ করা হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজ সহকর্মীদের তুলনায় তাকে বেতনের একটি স্বল্প অংশ দেওয়া হতো। সে সময়ে বোসকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনজন গুণী ব্যাক্তি – স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯৯ সালে ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্যারিসে প্রথম দেখা করেছিলেন। তারপর থেকে ১৯১১ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা বোসের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয়ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদের অমায়িকভাবে ব্যবস্থা করেন। বেদান্তিক কোন থেকে তার রচনার বিষয়বস্তুর ধারণা 'সমস্ত অস্তিত্বের একতা' দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হলেন। যখন পশ্চিমে একাডেমিক জার্নালে তার গবেষণা প্রকাশ করার জন্য বোসকে বৈষম্যের সম্মুখিন হতে হয়েছে তখন সিস্টার নিবেদিত তাকে উৎসাহিত করেছেন সেটি বই হিসেবে প্রকাশ করতে। নিবেদিত, বোসকে চারটি বই লিখতে সাহায্য

করেছিলেন: Living and Non-Living, Plant Response, Comparative Electro-Physiology and Irritability of Plants। এছাড়াও তিনি রয়াল সোসাইটির ফিলোসফিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত তার কাগজপত্র সংশোধন করেছেন।

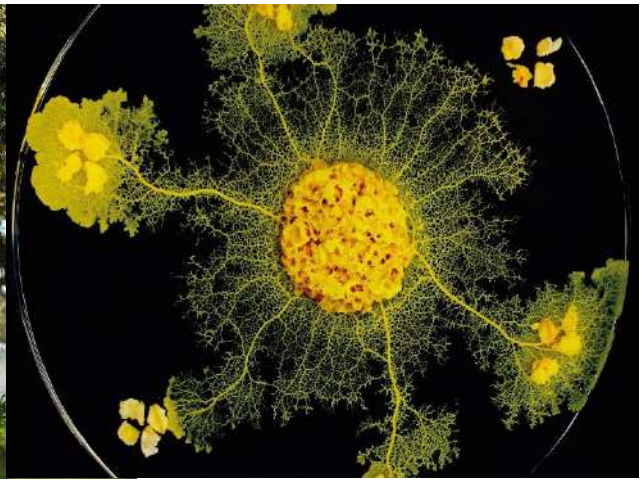

বোস তার কাজ গাছপালা থেকে মানুষের স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি দেখান যে, স্নায়ুর কর্মধারা নিউরাল পয়েন্টের পরিধির অবস্থা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তেজিত অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। তার প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার ধরণ সব জীবন্ত প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য এবং তিনি মনে করতেন , বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের একটি পরিমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি নেতিবাচক পরিবর্তনের পদ্ধতি ব্যবহার করে জেরানিয়াম থেকে ইউচারিস লিলির জৈবিক প্রণালীর উপর পরীক্ষা করেছেন, তাদের diphasic variation অধ্যয়ন করেছেন এবং নিজের উদ্ভাবিত ব্লক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। একক উদ্দীপনার প্রভাব এবং পাশাপাশি উদ্দীপকের পরিপত্তির উপর তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ‘Staircase effect’ –এর উপর মনোনিবেশ করলেন এবং ক্লান্তির উত্থান, তার উদ্দীপনা ও উদ্দীপনার ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে আয়ম্পর্কের মধ্যে ব্যবধানের উপর অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছেন। বোস ক্রেস্কোগ্রাফ নামক একটি অত্যন্ত অত্যাধুনিক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যা বাহ্যিক উদ্দীপকের কারণে সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষন এবং রেকর্ড করতে পারে। তিনি তার গবেষণায় বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়া সজীব এবং নির্জীব এর মধ্যে একটি লিঙ্ক টানার চেষ্টা করেছেন এবং ১৯০২ সালে তার মূল কাজ Responses in the Living and Non-living, লিখেছেন। ক্রেসকোগ্রাফব্যব হার করে জগদীশ চন্দ্র বসু সার, আলোকরশ্মি ও বেতার তরঙ্গের প্রতি গাছপালার প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু বোস এটাকে আর এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন প্রাথমিকভাবে প্রবাহের উপর সিস্টেমের মধ্যে ধাতু প্রতিক্রিয়ার কাজ প্রতিক্রিয়াশীল ইলেকট্রো-মোটিভ বৈচিত্র ঘটায়। তিনি আরও দেখালেন, কিভাবে প্রতিক্রিয়া কার্ভ বিভিন্ন সংস্থার প্রভাবে পরিবর্তিত হয় এছাড়াও তিনি দেখলেন অতিরিক্ত চাপের কারণে ধাতব, সিস্টেমে ক্লান্তি হচ্ছে, এবং সময়ের সাথে ক্লান্তির উপস্থিতির চিহ্ন সময়ের সাথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বোসিয়ান থিসিস অনুযায়ী, সজীব এবং নির্জীব –এর মধ্যে কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই। ১৯০১ সালের ১০ই মে, লন্ডনে গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল ইন্সটিটিউশনে একটি বক্তৃতা প্রদর্শনের সময় তিনি তার ইলেক্ট্রোগ্রাফিক রেকর্ডিং বা ধাতুর ‘স্ব-নির্মিত রেকর্ড’ রেফারেন্স সহ ঘোষণা করেছিলেন যে, পেশী এবং উদ্ভিদ বিভিন্ন উদ্দীপনয় সারা দেয়।

১৯০২ সালে তার ঋকবেদিক প্রবন্ধের সুত্র লিপিতে সম্ভবত সবচেয়ে নির্দেশিত প্রমাণ তার অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি ইশারা করলেন যে প্রাচীন ভারতীয় দ্রষ্টারা একজনের স্বাভাবিক ইন্দ্রীয় দিয়ে সনাক্ত করার যে ঘটনা খুব সূক্ষ্ম ছিল সেটা স্বীকৃত কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক দিক থেকে তাদের প্রকৃত স্বীকৃতি ছিলনা এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র বিকশিত হয়নি যা আধুনিক বিজ্ঞানকে প্রাচীনদের থেকে অনেক দূরে যেতে দিয়েছে। এটা ব্যক্ত করতে বোস বিখ্যাত প্রাচীন উপনিষদীয় বাক্য ব্যবহার করেছেন : ‘সর্ব প্রাণ এজতি নিঃসুতম’ ; যার অর্থ হল, সব কিছু সূক্ষ্ম শক্তি থেকে উদ্ভূত হয় এবং অভ্যন্তরে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। ধাতুর নির্দিষ্ট কর্মের একটি প্রাথমিক রূপ হল প্রাণ, অনুভুতি এবং জীবন – এটি বিতর্কিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও অকালপক্ক কিন্তু মজার বিষয় হল, বিপ্লবে এটি তার সাহসী পদক্ষেপ। যেমন রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে, বসুর কাজ 'ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চেতনার সরমর্ম, ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলনের গর্ব ও ঐতিহ্য'। ঐতিহাসিক ভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা সভ্যতা, ধারণা এবং চিন্তা একত্রীকরণের কাজ করার জন্য বসু সচেষ্ট ছিলেন।

১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বসু প্রস্তাব করেছিলেন: "আপনারা জানেন যে, এই মূহুর্তে পশ্চিমে প্রচলিত প্রবণতা হল শিক্ষার অত্যাধিক উপ-বিভাগের প্রত্যাবর্তন। নতুন উপাদানের শ্রেণীবিভাগে এমন বৃত্তি ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রথমে সাহায্য করে, কিন্তু যদি খুব একচেটিয়াভাবে এটি অনুসরণ করা হয়, তখন সত্যের সর্বাঙ্গীণতা বা ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ হয়। অনুসন্ধান অন্তহীন। উপলব্ধি আমাদের সকলকে এড়িয়ে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই অনুসন্ধান থেকে আমাদের কাছে ঐক্যের ধারণা আসে এবং তা আমরা আঁকড়ে ধরে রাখবো"। চার্লস ডারউইন বলেছেন: "স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আজ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তার সংশ্লেষণের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটিই জ্ঞানের সুত্র ও সত্য বলে আমি মনে রাখতে চাই। আমি গর্বিত বোধ করি যে, আমি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ডক্টরেট করেছি, যেটির সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। সেই কলেজের মধ্যে তার একটি মূর্তিও রয়েছে"।

তিনি সত্যিই একজন জগদীশ ছিলেন এবং চিরকালের জন্য ভারতরত্ন হয়ে থাকবেন। তিনিই বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম যিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা শক্তির অধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

সুভাষ চন্দ্র বসু বা গান্ধীজীর অনেক আগেই, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু পশ্চিমী দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আহবান করেছিলেন এবং ভারতীয় মানসিকতায় একটি মৌলিক পরিবর্তন উপলব্ধি করেছিলেন যা ছিল,

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংশ্লেষণে সত্য অর্জন।

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতের বিজ্ঞান ও স্বনির্ভর বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া

১৭৫৭ : ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বিজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে।

১৭৬৭ : ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র স্থাপন এবং তার বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ মূল্যায়নের জন্য 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৪ : 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৮ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ইউরোপীয়রা এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়।

১৭৮৭ : ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে দেশের বোটানিক্যাল সম্পদ রক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কলকাতার শিবপুরে, হুগলী নদীর তীরে ৩০০ একর জমি জুড়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়।

১৮১৭ : কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজ হিসাবে পরিচিত। পরাধীন ভারতের অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই কলেজে অধ্যয়ন ও পরে অধ্যাপনা করেছেন।

১৮১৮ : The Trigonometrical Survey of Peninsular India –এর নাম পরিবর্তন করে Great Trigonometrical Survey of India (GTS) রাখা হয়।

১৮৫৩ : ১৬ই এপ্রিল, ব্রিটিশরা ভারতের প্রথম রেল চালু করেছিল, মূলত ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থানগুলি থেকে বিভিন্ন বন্দরে প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে পরিবহন করে পুনরায় ইংল্যান্ডে পরিবহন করার জন্য।

১৮৫৭ : ২৪শে জানুয়ারী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এশিয়ার প্রথম মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৬ : ১৫ই জানুয়ারী মহেন্দ্রলাল সরকার ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে মুক্ত বিজ্ঞান প্রচারের লক্ষ্যে Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯১ : প্রমথ নাথ বসু দ্বারা Indian Industrial Association প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯৪ : জগদীশ চন্দ্র বসু তার মাইক্রোওয়েভ সংক্রান্ত গবেষণায় প্রথম বেতার তরঙ্গ সনাক্তকারী হিসেবে ক্রিস্টাল ব্যবহার করে।

১৮৯৫ : কলকাতায় জগদীশ চন্দ্র বসু দ্বারা প্রথম মাইক্রোওয়েভ এর ট্রান্সমিশন সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয়। বোসের যুগান্তকারী প্রদর্শন আজ মোবাইল, টেলিফোন, রাডার, স্যাটেলাইট, রেডিয়ো, টেলিভিশন, ওয়াইফাই, রিমোট কন্ট্রোল এবং অগণিত অ্যাপ্লিকেশন –এ ব্যবহৃত প্রযুক্তির ভিত্তি।

১৯০১ : আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দ্বারা ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী, Bengal Chemicals & Pharmaceutical Works Ltd.প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০২ : বাংলার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র কলকাতায় জাতীয় শিক্ষার ধারণা প্রচারের জন্য 'The Dawn Society' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৪ : যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ The Association for the advancement of Scientific and Industrial Education (AASIE) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ : The Dawn Society শিক্ষার সমান্তরাল কাঠামো সংগঠিত করার জন্য

National Council of Education (NCE) হয়ে ওঠে। তারকনাথ পালিত এবং নীলরতন সরকার দ্বারা The Society for the Promotion of Technical Education চালু করা হয়।

১৯০৮ : The Calcutta Mathematical Society প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

১৯০৯ : জামসেটজি টাটার সাহায্যে বাঙ্গালোরে The Indian Institute of Science প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং –এ মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করা হয়।

১৯১৩ : এলাহাবাদ থেকে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচার করার জন্য Vijnana Parishad প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯১৫ : সত্যেন্দ্রনাথ বসু জার্মান ভাষায় আইনস্টাইনের মূল গবেষণাপত্র 'সাধারণীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্ব' ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৯১৭ : জগদীশ চন্দ্র বসু Bose Research Institute প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২০ : The Institute of Engineers প্রতিষ্ঠিত হয়, যা প্রকৌশলে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯২৪ : প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলকাতায় Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠা করেন। 'Plank's law and the Hypothesis oflight Quanta" –এর উপর সত্যেন্দ্রনাথ বোস একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে পাঠান। আইনস্টাইন তারসাথে একমত হন এবং বোসের অনুবাদ জার্মান ভাষায় *Zeitschrift fur Physik* জার্নালে বোসের নামে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল Bose-Einstein Statistics -এর ভিত্তি।

১৯৩০ : চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন তার অগ্রণী কাজ Raman Effect –এর জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৩১ : ১৭ই ডিসেম্বর, Indian Statistical Institute প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিস কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে Statistical Laboratory স্থাপন করেন।

১৯৩৪ : সি ভি রমন, বাঙ্গালোরে The Indian Academy of Sciences প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৫ : প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে The Indian Science News Association প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের বৈজ্ঞানিকদের সামাজিকও সুবিধা দিতে কে এস ভারদাচার, Madras Science Club চালু করেন।

১৯৩৬ : বীরবল সাহনী Royal Society of London (FRS) –এর ফেলো হিসাবে নির্বাচিত হয় এবং প্রথমবার একজন ভারতীয় উদ্ভিদবিদ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন।

১৯৪২ : ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম গবেষণা ও ক্রমবিকাশ প্রতিষ্ঠান।

১৯৪৫ : হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার পরিচালনায় বোম্বেতে Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৬ : লখনৌতে The Birbal Sahni Institute of Paleobotany প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনেতে শঙ্কর পুরুষোত্তম আগারকারের নেতৃত্বে Maharashtra Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ : মেঘনাদ সাহা কলকাতায় Indian Institute of Nuclear Physics প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে Saha Institute of Nuclear Physics নামে পরিচিত।

কিংবদন্তি : আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (২রা আগস্ট, ১৮৬১ – ১৬ই জুন, ১৯৪৪)

বিজ্ঞানীর পোশাকে একজন বিপ্লবী

Dr. Rajeev Singh

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গণ্য করা হয় যিনি প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের সঙ্গে উদীয়মান আধুনিক বিজ্ঞানের জগতের মিলন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তিনি একজন গবেষক যিনি আধুনিক রসায়নে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও শিক্ষাগত সংস্কারে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের আধুনিক রসায়নের জনক হিসেবে স্বীকৃত।

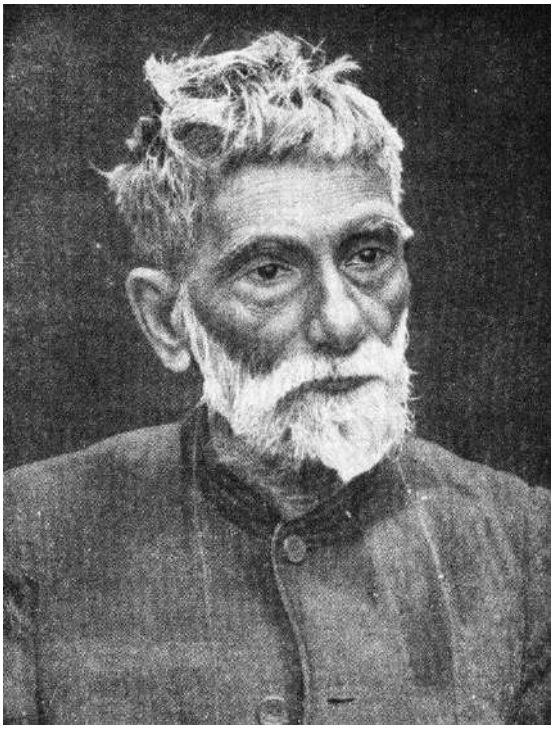

Acharya Prafulla Chandra Ray

বাল্যকাল : ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট যশোর জেলার রারুলি কাটিপাড়া (বর্তমানে বাংলাদেশে) গ্রামে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। তার পিতা-মাতা হরীশ চন্দ্র রায় এবং ভুবনমোহিনী দেবী, উচ্চ শিক্ষার প্রশংসা করতেন এবং তার বাড়িতে বিশাল বড় লাইব্রেরী ছিল। পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তার লেখাপড়া শুরু হয় এবং পড়ে কলকাতায় সম্পন্ন হয়। বি.এ অধ্যয়নের সময় তিনি Gilchrist scholarship (১৮৮২) পেয়েছিলেন এবং ২৬ বছর বয়সে Edinburgh University থেকে অজৈব রসায়নে তাকে D.Sc (১৮৮৭) প্রদান করা হয়। এডিনবার্গের নর্থকোট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার স্টাফোর্ড লর্ড রেক্টর ১৮৮৫ সালে, 'ভারত বিদ্রোহের আগে ও পরে' এই বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন এবং তিনি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি পুরস্কৃত না হলেও লিখেছেন, " আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, কিন্তু আমার প্রবন্ধের পাশাপাশি অন্যটির একসাথে 'প্রক্সিম অ্যাক্সোসিট' হিসাবে সমভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। ভারতকে উপনিবেশ থেকে মুক্ত করার আবেদন ছড়িয়ে দিতে তিনি তার প্রবন্ধের প্রতিলিপি বিতরণ করেন। স্কটিশ সংবাদপত্র, 'The Scotsman' মন্তব্য করেছেন ;"এতে ভারত প্রসঙ্গে যা তথ্য রয়েছে ত্য অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না"।

চাকরির জন্য সংগ্রাম : ভারতে ফিরে এসে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে চাকরির আবেদন করেন, কিন্তু তার কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি একবছর বেকার ছিলেন। তখনকার দিনে চাকরি ছিল সীমিত এবং বেশীরভাগই ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত। ২৫০ টাকার সামান্য বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে একজন অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তাকে নিয়োগ করা হয়। তার সঙ্গে এই অন্যায় নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন ইন বেঙ্গল, এ.ডাব্লিউ. ক্রফ্ট –এর সাথে দেখা করতে দার্জিলিং জন। রায়ের অভিযোগে ক্রফ্ট ক্রুদ্ধ হয় এবং সে চিৎকার করে

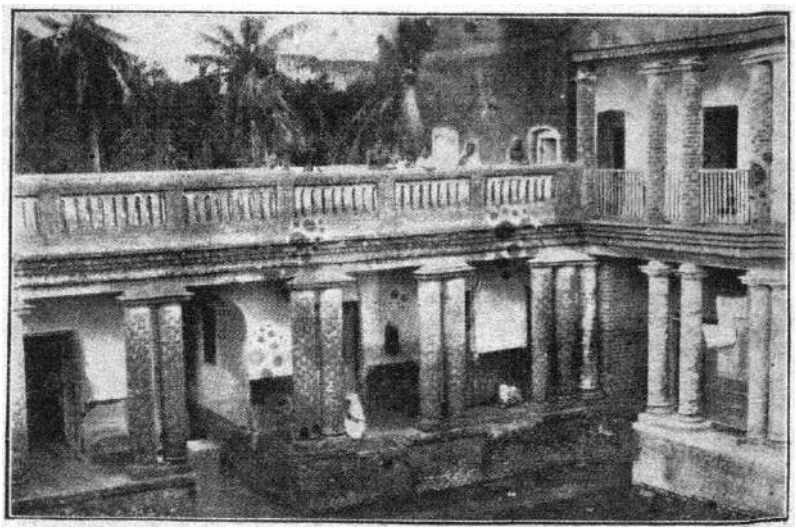

House of acharya Prafulla Chandra Ray in Khulna, now in Bangladesh

বলে, "এই পদ নিতে আপনাকে কেউ বাধ্য করেনি, আপনার জীবনের অন্যান্য রাস্তা খোলা আছে"। রায় এই অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন কিন্তু গবেষণা এবং শিক্ষাদানের প্রতি তার আবেগের কারণে তিনি এই চাকরি মেনে নিলেন।

১৯১৬ সালে তিনি কলকাতার ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স –এ যোগদান করেন যেখানে তিনি তার ছাত্রদের সাথে গবেষণা চালাতেন এবং এটিকে শ্রেষ্ঠত্বর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় তার ছাত্ররা তাকে 'আচার্য্য' হিসেবে সম্বোধন করতে শুরু করেন।

একজন শিক্ষক ও গবেষক : একজন শিক্ষক হিসেবে রায় দর্শনে বিশ্বাস করতেন, তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করেন যেখানে বলা হয়েছে, " নিজের ছেলে এবং শিষ্য ছাড়া সবার জন্য জয় কামনা করবে"। তিনি তার আত্মজীবনীতে তার ছাত্রদের সম্পর্কে লিখেছেন, "তাদের ও আমার মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা রাসায়নিক বন্ধনের মতো সূক্ষ্ম। আমি তাদের হোস্টেলের ঘরে প্রায়ই দেখা করতে যেতাম এবং সন্ধ্যাবেলায় ময়দানে হাঁটার সময় তারা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। ১৯২১ সাল থেকে তিনি বেতন গ্রহণ বন্ধ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই টাকা পরীক্ষাগার উন্নয়নে ব্যয় করতে অনুরোধ করেন। প্রধানত দরিদ্র অনেক ছাত্র ছাত্রী তার সাথে বসবাস করতেন এবং তিনি যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাগার্জুন পুরস্কার এবং আশুতোষ মুখার্জী পুরস্কার নামে বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অবসর গ্রহণ করার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য তিনি বিপুল অর্থ দান করেন।

NATURE

A WEEKLY ILLUSTRATED JOURNAL OF SCIENCE

THURSDAY, MARCH 5, 1908.

THE LIFE-WORK OF A HINDU CHEMIST.

Sir Thomas Edward Thorpe wrote a two-page front article in *Nature* magazine on Acharya PC Ray, titled,"The life-work of a Hindu Chemist"

রায় একজন কৃত্তিম অজৈব রসায়নবিদ ছিলেন বিশেষভাবে thio-organic compounds এবং তার বিখ্যাত কাজ ছিল নাইট্রাইটের রসায়নের উপর। পর্যায় সারণীতে শূন্যস্থান পূরণ করতে ১৮৯৪ সালে নতুন মৌল আবিস্কারের জন্য তিনি বিরল ভারতীয় খনিজগুলির বিশ্লেষণ শুরু করেন। তিনি প্রথম, Mercurous Nitrite-এর পূর্বে অজ্ঞাত যৌগ, $Hg_2(NO_2)_2$ -এর সংশ্লেষণ বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "Mercurous Nitrite আবিষ্কার আমার জীবনের একটি নতন অধ্যায় খলেছে"।
এই যৌগটি তুলনামূলকভাবে অস্থির আয়ন একত্রিত হয়ে একটি স্থিতিশীল পদার্থ গঠনের উদাহরণ। নেচার মাগাজিন, তার May 28, 1896 –এর সংখ্যায় প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের Mercurous Nitrite এর উপর গবেষণাপত্র সম্পর্কে একটি মুল্যবান মন্তব্য হিসেবে লিখেছে, "এই পরম্পরা ভারতে আধুনিক রসায়ন গবেষণা স্কুলের প্রথম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

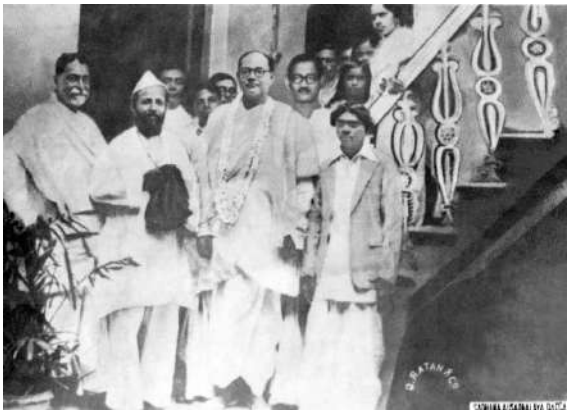
Netaji Subhas Chandra Bose at Sadhana Aushadhalaya in 1924

রাষ্ট্রের জন্য বিজ্ঞানী : রায় ব্রিটিশদের আগমনের আগে থেকেই বিদ্যমান উচ্চ বিকশিত ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থ প্রচারের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দেশীয় উৎপাদনকে ধ্বংস করেছিল। একটি বহিরাগত এবং আক্রমনাত্মক শাসনের অধীনে, ধীরে ধীরে ভারতীয়রা অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কোনও নতুন উদ্যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

১৮৮০ এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলা যখন উত্তাল তখন ১৯০৫ সালে দেশভাগের সাথে শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে স্বদেশী চেতনার আহবান করা হয়। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিশ্বাস করতেন ভারতীয় পণ্য, শিক্ষা, শিল্প বিপ্লবের সূচনা, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আধুনিকীকরণের দ্বারা ভারতীয়রা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে প্রতিদ্বন্দীটা কজরতে জকরতে সক্ষম। তিনি ক্রমাগত একটি সিস্টেমের প্রয়োজন অনুভব করেন জা হবে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বনির্ভর এবং বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিত শিক্ষিত ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম গবেষণাগার স্থাপন, ১৯২৪ সালে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের প্রথম গবেষণা জার্নাল The Journal of Indian Chemical Society চালু করা ইত্যাদি নতুন সুযোগ তৈরি এবং বিকাশ তিনি অব্যহত রেখেছিলেন। তিনি স্বদেশী অনুপ্রাণিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (NCE) –এর সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। ৭০০ টাকা বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ গবেষণা ল্যাবরেটরী সহ ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী , বেঙ্গল কেমিক্যালস (বর্তমানে, Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.) প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বেঙ্গল মৃৎ-শিল্প, বেঙ্গল ক্যানিং অ্যান্ড কন্ডিমেন্ট, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্ক্স, বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, বেঙ্গল পেপার, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র কটন মিল, জাতীয় ট্যানারি এবং ভারতীয় স্কেলস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি উদ্যোগগুলিকে প্রতিষ্ঠা অথবা আর্থিক সমর্থন করেন। বিভিন্ন শিল্পের মালিক হয়েও তিনি কোনও বেতন গ্রহণ করেননি। তার বই, A History of Hindu Chemistry সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের প্রতি পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের মনোযোগ দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং রাসশাস্ত্রের (Rasashastra) মৌলিক বিষয় বিশ্বায়নের দিকে পরিচালিত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চরম পর্যায়ে প্রফুল্ল রায় বিখ্যাত অনুপ্রেরণামূলক উক্তি প্রদান করেছেন, " বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ পরে না..."।

সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকা সত্বেও তিনি সেই সময়ে ঘটে চলা দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি।

তিনি ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী অনুভুতি বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ব্রিটিশদের সমালোচনা করেন এবং তাদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনিবার্য ক্ষোভ তৈরির বিষয়ে ব্রিটিশদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাদের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য তাদের মূল্য দিতে হবে।

My Experiment with Truth বইটিতে গান্ধীজী লিখেছেন, "আমার স্মৃতিতে যারা অগ্রগণ্য হয়ে আছে তার মধ্যে একজন, পি.সি. রায়। ব্রিটিশরা যখন হিন্দু ও মুসলিমদের বিভাজন ও নির্বাচন (ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা Morley Minto Reforms) বিধান পরিষদের নিয়ম চালু করে তখন কিন্তু কংগ্রেস উদাসীন চিলসে সময় প্রফুল্ল রায় ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধীতা করেন। ১৯১৯ সালে গান্ধীজির খেলাফত আন্দোলনের ভুলের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে যখন দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে নেতাজীর নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস বিভক্ত ছিল তখন সুভাষ চন্দ্র বসুর সমর্থনে তিনি সোচ্চার হন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নাৎসী জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করেছিল তখন প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিশিষ্ট ভারতীয়দের সাথে ভারতীয়দের প্রতি আহবান জন্যে একটি ইশতেহার জারি করেছেন এবং USSR এর সাথে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। মহান জ্যোতিপদার্থবিদ মেঘনাদ সাহা, রায় সম্পর্কে একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন, "স্যার পি.সি রায়কে A History of Hindu Chemistry বই এর উপর লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু

রসায়নের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানান হয়েছিল। যখন তিনি বক্তব্য রাখছিলেন, দর্শকদের মধ্যে একজন তরুণ ইংরেজ প্রোফেসর তাকে উপহাস করেন। তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিলেন। যন্ত্রপাতি বর্ণনা করার পরে, তিনি তার হাতে একটি mercuric sulphide –এর পিন্ড নিয়েছিলেন যেটি এক সময় ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। স্যার পি.সি. রায়, পিন্ডটি তার হাতে নিয়ে বললেন : "বন্ধুরা এই দেখ, ভারতীয়রা, দুই হাজার বছর আগে অপরিপক্ক অশোধিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মানুষের দুর্ভোগ কমাতে এমন একটি সুন্দর রাসায়নিক প্রস্তুত করেছিলেন যখন আমাদের পূর্বপুরুষ কাঁচা ফল খেতেন এবং গাছের ছাল পরতেন"। ইংরেজ ব্যক্তির মুখ লাল হয়ে গেল এবং তিনি হল থেকে ছুটে চলে গেল। পরবর্তীতে তিনি পি.সি.রায়ের বড় শিষ্য হয়ে ওঠেন।

তিনি চেয়েছিলেন যাতে ভারতীয় ছাত্ররা নতুন কৌশল ও দক্ষতা শিখতে পারে এবং শুধুমাত্র একটি আরামদায়ক কাজের জন্য ডিগ্রী অর্জন না করে স্বাধীন উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে।

An image from the book 'History of Hindu Chemistry'

QUIZ: Scientific Endeavours by Indians Before Independence

1. Who was the first Indian graduate in science from a British University?
A. Prafulla Ray Chandra
B. Pramatha Nath Bose
C. Satyendra Nath Bose
D. None of the above

2. Who founded the Bose Institute in 1917?
A. Satyendra Nath Bose
B. Jagadis Chandra Bose
C. Pramatha Nath Bose
D. None of the above

3. Who founded the Indian Association for the Cultivation of Science in 1876?
A. Chandrasekhara Venkata Raman
B. Meghnad Saha
C. Mahendralal Sircar
D. None of the above

4. Which Indian scientist won Nobel Prize in Physics in 1930?
A. Chandrasekhara Venkata Raman
B. Satyendra Nath Bose
C. Prafulla Chandra Ray
D. None of the above

5. In which year was The Dawn Society established to promote education and Indian heritage, culture and scientific achievements?
A. 1902
B. 1947
C. 1911
D. None of the above

6. Who wrote *A History of Hindu Chemistry*?
A. Prafulla Chandra Ray
B. Bhagavat Simhaji
C. Mahendralal Sircar
D. None of the above

7. Who was the first scientist to propose the existence of life in plants?
A. Mahendralal Sircar
B. Jagadish Chandra Bose
C. Meghnad Saha
D. None of the above

8. In which year was Acharya Prafulla Chandra Ray born?
A. 1778
B. 1832
C. 1861
D. None of the above

9. When was Asiatic Society of Bengal, considered the landmark for the institutionalisation of Western science in India, established?
A. 1787
B. 1784
C. 1857
D. None of the above

10. Who founded The Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education (AASIE) in 1904?
A. Satyendra Nath Bose
B. Prafulla Chandra Ray
C. Jogendranath Ghose
D. None of the above

11. Which was the first and biggest institute established by the native Indian states?
A. National Council of Education
B. Kala Bhavan Technical Institute
C. Bengal Technical Institute
D. None of the above

12. Who was the first Indian Vice Chancellor of Calcutta University?
A. Dadabhai Naraoji
B. Debendranath Tagore
C. Gurudas Bandhopadhyaya
D. None of the above

13. Which botanist of India is well-known for the invention of the crescograph?
A. Satyendra Nath Bose
B. Jagdis Chandra Bose
C. Homi Jehangir Bhabha
D. None of the above

14. Who was the pioneer of palaeobotanical research in India?
A. Birbal Sahni
B. Vikram Sarabhai
C. Manali Kallat Vainu Bappu
D. None of the above

15. Who founded the Bengal Chemicals & Pharmaceuticals, India's first pharmaceutical company?
A. Jagadis Chandra Bose
B. Prafulla Chandra Ray
C. Satyendra Nath Bose
D. None of the above

16. When was Indian National Science Academy established?
A. 1935
B. 1931
C. 1947
D. None of the above

17. Which western scientist was invited by Pt. Madan Mohan Malaviya to teach at Benaras Hindu University?
A. Louis de Broglie
B. Max Planck
C. Niels Bohr
D. Albert Einstein

18. Who founded the *Indian Journal of Physics* in 1926?
A. S. Ramanujan
B. C V Raman
C. Homi Jehangir Bhabha
D. None of the above

19. Name the Indian scientist who discovered the function of ATP as the source of energy in cell while researching at Harvard University but was still denied professorship there?
A. K. S. Krishnan
B. Shanti Swarup Bhatnagar
C. Meghnad Saha
D. Yellapragada Subba Rao

20. Inspired by the IACS, who founded the Maharashtra Association for the Cultivation of Science in 1946?
A. Nelson Annandale
B. Shankar Purushottam Agharkar
C. J. N. Tata
D. Vishnushastri Chiplunkar

Answers: 1 (B), 2 (B), 3 (C), 4 (A), 5 (A), 6 (A), 7 (B), 8 (C), 9 (B), 10 (C) , 11 (B), 12 (C), 13 (B), 14 (A), 15 (B), 16 (A), 17 (D), 18 (B), 19 (D), 20 (B)

Recommended Reads

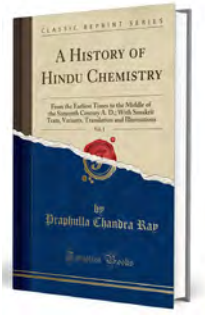

A History of Hindu Chemistry

by Acharya Prafulla Chandra Ray, 1902

One of the rare and important books published in the 20th century, it delineates the history of chemistry and science from the ancient times to the middle of the 16th century, with Sanskrit texts, variants, translation and illustrations.

Ray reminds his readers that the Greeks themselves derived their knowledge of many things from the Hindus, who had, for example, solved the 47th proposition of the first book of Euclid, 200 years before the birth of Pythagoras. Relying on this and similar evidence, Ray quotes other weighty opinions, and furnishes additional evidence in support of the view that the Arabs were even more indebted to the Hindus. In the eighth century, the Caliphs of Baghdad ordered several of the medical works of India to be translated, and learned Arabs were sent to India, both then and later, to study science.

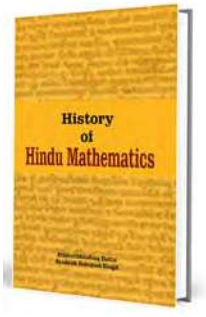

History of Hindu Mathematics

by Bibhutibhushan Datta and Awadhesh Narayan Singh, 1930

The book is a treatise on the history of Indian mathematics, which was originally published in two parts; the planned third volume was never published. The book has since been reissued in one volume. It provides a glimpse into the antiquity and value of India's achievements in the realm of mathematics dating back to a few thousand years. Based on the original work of Datta, the manuscript was entrusted to his junior, Singh, when the former turned an ascetic after retirement.

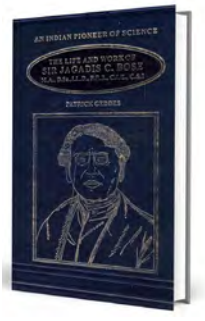

The Life and Work of Sir Jagadis C Bose

by Sir Patrick Geddes, 1920

Geddes was an evolutionary biologist, a sociologist and an urban planner who first met Bose at Exposition Universelle in Paris in 1900. When Geddes visited India some years later, he got introduced to the entire length of Bose's scientific work, conducted, as he observed, despite British obstacles. He was convinced of writing Bose's biography because he felt that the latter's scientific achievements not only changed the direction of science in India, they also won recognition for Indians their exact capacity for science.

A History of Hindu Civilisation during British Rule

by Pramatha Nath Bose in 3 volumes, 1896

This book brings together a comprehensive history of Hindu civilisation during the British Rule. The writings have been divided into three categories — socio-religious conditions, social conditions, and industrial conditions. Socio-religious conditions discuss topics like caste system, marriage customs, sati, sea voyages, forbidden food and drink, etc. Social conditions cover topics such as the social position of women, joint family culture, amusement, food, dress, ornaments, etc. Industrial conditions focus on agriculture, art, industries, modern methods of manufacturing, mining industries, etc.

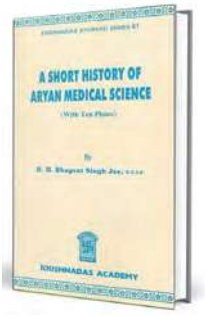

A Short History of Aryan Medical Science

by Bhagavat Simhaji, 1876

An elaborate and complete history of Hindu medical science with illustrations. The book delves into the Hindu theory of creation, theory of Indian medicine, Indian Materia medica, vicissitudes of Indian medicine and surgery, etc., in detail. The author was the ruling Maharaja of Gondal (in Kathiawad, Gujarat) from 1869 to 1944 and the only royal to take a medical degree — he studied medicine at the University of Edinburgh and graduated as a doctor in 1895.

The Calcutta Journal of Medicine

by Mahendralal Sircar, 1868

Mahendralal Sircar, second MD from Calcutta Medical College and the renowned physician who had the privilege of treating Sri Ramakrishna, was also a brilliant homeopath. He founded the journal, with himself as editor, to popularise and propagate Homeopathic treatment. He is best remembered as the founder of India's first indigenous scientific institute, the Indian Association for the Cultivation of Science (IACS).